ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৩ সংখ্যা ।। ১৪ ভাদ্র, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৩১ আগস্ট, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

কেন্দ্রকে সি আর পি এফ-এর সতর্কবার্তা

পৃথক মুসলিম ল্যাণ্ড তৈরির ছক কষছে উগ্রপন্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মুসলিমদের জন্য পৃথক একটি 'হোমল্যান্ড' তৈরির জন্য বাংলাদেশের সহায়তায় দেশবিরোধী গোষ্ঠীগুলি একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করেছে বলে সি আর পি এফ এক গোপন রিপোর্ট পাঠিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছে। এই রিপোর্টে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে, এইসব জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি ইতিমধ্যেই আলাদা হোমল্যান্ডের দাবী সম্বলিত পোস্টার, ব্যানার ইত্যাদি নিয়ে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে ঢুকে পড়েছে। এদের বেশিরভাগই সন্দেহভাজন বাংলাদেশী। ওই রিপোর্টে এইসব দেশবিরোধী গোষ্ঠীগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে — জাতিগত, অত্যাচারী, সন্ত্রাসবাদী এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মুসলিম জঙ্গীগোষ্ঠী।

সি আর পি এফ-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মুলত ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠী। এই এলাকায় তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য তারা কৌশলগতভাবে জাতিগোষ্ঠী ও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিয়ে থাকে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দেশবিরোধী গোষ্ঠীগুলি প্রধানত আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের দ্বারা প্রভাবিত। অন্য দেশদ্রোহী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে জাতিগোষ্ঠীর স্বার্থেরই প্রাধান্য। সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে বহু মুখ্যমন্ত্রীই উত্তর পূর্বাঞ্চলে ইসলামি মৌলবাদীদের উত্থান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রাজ্যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছে বলে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ২০০১-এর জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৯১ থেকে ২০০১ — এই দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৬৪.১ শতাংশ এবং সারা দেশের মধ্যে এটাই সর্বোচ্চ। এছাড়া মসজিদ ও মাদ্রাসার সংখ্যা লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে।

নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী এন এস সি এন (আই এম)-এর সঙ্গে মুসলিমদের জড়িত থাকার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এইসব ইসলামিক মৌলবাদীরা হুজি এবং অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলিকেও মদত দিয়ে থাকে। রাজ্যের অভ্যন্তরে এইসব যোগাযোগের সুযোগ নিয়ে ইসলামিক উগ্রপন্থীরা নাগাল্যান্ডে 'স্লিপার সেল' তৈরি করছে। আরও একটা বিষয় হলো, ইসলামি উগ্রপন্থীরা এন এস সি এন (আই এস) এবং অন্যান্য সন্ত্রাসবাদীদের থেকে আলাদা করে একটি নতুন দল গড়ছে যারা নিজেদের মতলব হাসিলের লক্ষ্যে অন্যান্য মুসলিম গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে হাত মেলাবে। শুধু মণিপুরেই এরকম ৪৩টি ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠী সক্রিয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বর্তমানে সক্রিয় দেশবিরোধী গোষ্ঠীর সংখ্যা জম্মু-কাশ্মীরের থেকেও বেশি।

বিশেষ আকর্ষণ

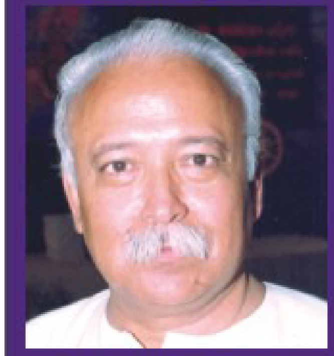

সাক্ষাৎকার ঃ মোহনরাও ভাগবত.. পৃঃ ২

আমেরিকায় বাড়ছে হিন্দু ভাবধারা

গূঢ়পুরুষ ।। খোদ আমেরিকায় এখন মার্কিন নাগরিকরা স্বেচ্ছায় হিন্দু সনাতন ধর্মের অনুরাগী হয়ে চার্চের নির্দেশ মানছেন না। তাঁরা হিন্দুর ধর্মীয় অনুশাসনকে 'বাস্তবসম্মত' এবং গ্রহণযোগ্য বলে মনে করছেন। এই তথ্য জানিয়েছে, আমেরিকা থেকে প্রকাশিত সারা বিশ্বে জনপ্রিয় সংবাদ সাপ্তাহিক 'নিউজ উইক'। এই সাপ্তাহিকের রিলিজিয়ন এডিটার লিজা মিলার জানিয়েছেন, হিন্দু সনাতন ধর্মের আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা এবং জন্মান্তরবাদ ইত্যাদি মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে দ্রুত প্রসার লাভ করছে। লিজা মিলার জানিয়েছেন, আমেরিকার ৬৫ শতাংশ খৃস্টান নাগরিক এখন স্বীকার করেন, বিশ্বের সব ধর্মই মহান। খৃস্ট ধর্মই একমাত্র শ্রেষ্ঠ ধর্ম এবং একমাত্র যীশুর শরণ নিলেই 'গডের' আশ্রয় পাওয়া যায়, এমন দাবী অসত্য। মার্কিনীরা মনে করেন, এমন দাবী স্বয়ং যীশুও করেননি। সমাজে চার্চের প্রভুত্ব বজায় রাখতে পাদরিরা এইসব অসার অসত্য প্রচার করেছে। মার্কিনীরা মনে করছেন যে, বর্তমান অস্থির সমাজে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বাণী অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য।

নিউজ উইক-এ লেখা লিজা মিলারের প্রবন্ধের সারাংশ কলকাতা থেকে প্রকাশিত ইংরাজি দৈনিক 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া'র ১৮ আগস্ট তারিখে 'টাইমস গ্লোবাল' সেকশনে ছাপা হয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে দৈনিকটির প্রতিনিধির লেখা সংবাদ প্রবন্ধে বলা হয়েছে, "হিন্দু সনাতন ধর্মে ঈশ্বর ও পরকাল সম্পর্কে যে আধ্যাত্মিক ভাবনার কথা বলা হয়েছে, তা সত্য। এই বিষয়ে বাইবেলের বক্তব্য অসার রূপকথা।" মিলারের প্রবন্ধ উদ্ধৃত করে টাইমসের প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে, নিউজ উইক সম্প্রতি 'ঈশ্বর, পরকাল ও জন্মান্তরবাদ' নিয়ে সারা আমেরিকা জুড়ে এক বিশেষ সমীক্ষা চালায়। সেই সমীক্ষার ফলাফলে জানা গেছে, যে মার্কিনীরা হিন্দু সনাতন ধর্মের প্রতি যতটা অনুরাগী ততটা চার্চের প্রতি নন। সমীক্ষায় ৬৫ শতাংশ খৃস্টান মার্কিন নাগরিক বলেছেন, হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বাণীই এই বিষয়ে তাঁদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য।

নিউজ উইকের প্রবন্ধে লিজা মিলার বলেছেন, সমীক্ষায় মার্কিনীরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছেন, খৃস্ট ধর্মই বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম— এটা একেবারেই বাজে কথা। ঈশ্বরের সান্নিধ্য ও করুণা লাভ করতে গেলে চার্চের আশ্রয়ে যাওয়াই একমাত্র পথ, এমন কথা সংখ্যাগরিষ্ঠ মার্কিনীরা মানেন না। মার্কিনীরা এখন বিশ্বাস করেন আধ্যাত্মিকতা ও প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসন পৃথক। চার্চের নির্দেশিত পথে না চলেও ঈশ্বর লাভের সাধনা করা যায়। বিগত ২০০৫ সালে ঠিক এই বিষয় নিয়ে নিউজ উইক সাপ্তাহিক আমেরিকায় সমীক্ষা চালিয়েছিল। তখন এমনই মতামত জানিয়েছিলেন মাত্র ২৪ শতাংশ মার্কিন নাগরিক। মাত্র চার বছরে সংখ্যাটি ২৪ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় একটি বিষয়ে লিজা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, মার্কিনীরা এখন বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পর দেহের কোনও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। আত্মা দেহত্যাগ করে পুনরায় নব কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে। এই কথাই গীতার শাশ্বত বাণীতে বলা হয়েছে। কিন্তু বাইবেল বলেছে, মৃত্যুর পর দেহ কবরস্থ করতে। কারণ, শেষ বিচারের দিন বিদেহী আত্মা তার কবরস্থ দেহকে আশ্রয় করে 'পুনরুত্থান' করবে। তাই দেহকে কবর 'সংরক্ষিত' করার নির্দেশ চার্চ দিয়েছে।

এই নির্দেশটি এখন খৃস্টান মার্কিনীরা মানছেন না। তাঁদের মতে, 'শেষ বিচার' এবং মৃতের পুনরুত্থান নিছক একটি গালগপ্পো। মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাঁরা বরং হিন্দু সনাতন ধর্মে যে জন্মান্তরবাদ ও পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের কথা বলা হয়েছে, তাকেই সত্য

(ওরপর ৪ পতায়)

কোটি কোটি টাকা খরচ বাড়ছে না সাক্ষরতার হার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে কেন্দ্র সরকার 'রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশন' প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করলেও সাফল্য অধরাই থেকে গিয়েছে। এতদিন বাদে কেন্দ্র সরকার সমীক্ষা করে জানতে পেরেছে যে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কেন্দ্রের তরফে সরাসরি বোঝাপড়া করার কারণে রাজ্য সরকারগুলি ক্রমশই আগ্রহ হারিয়েছে। সেজন্য জাতীয় সাক্ষরতা মিশন কর্তৃপক্ষ নতুন নীতি ও কর্মপদ্ধতি ঠিক করে এগোতে চাইছে। এবার থেকে মহিলা কেন্দ্রিক বয়সের বাঁধা-ধরা সীমা ছাড়াই নতুন উদ্যমে রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশনের কাজ শুরু হবে। রাজধানী নতুন দিল্লীতে গত ২১ আগস্ট একাদশতম অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে বলে জানা গেছে।

নতুনভাবে রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা অভিযানের কাজ আগামী ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। রাজ্য সরকারগুলো এবং রাজ্যগুলোর পঞ্চায়েতিরাজ প্রতিষ্ঠান সমূহকেও এই কাজে যুক্ত করা হবে। ২০১৭ সালের মধ্যে সাতকোটি নিরক্ষরকে অন্ততপক্ষে সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন করে তোলার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হয়েছে। আর এর ফলে বর্তমানে ভারতবর্ষে সাক্ষরতার হার ৬৪.৮৪ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮০ শতাংশে পৌঁছাবে। এজন্য একাদশতম পরিকল্পনায় কেন্দ্র সরকার এই প্রকল্পে প্রতি মাসেই ৬০০০ কোটি টাকা খরচ করবে।

এদিকে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরোর মতো মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হলেও কেন্দ্রের দুই মহিলা মন্ত্রী — অম্বিকা সোনী (তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী) ও কৃষ্ণা তীরথ্ বৈঠকেই উপস্থিত ছিলেন না। যদিও পঞ্চায়েতিরাজ মন্ত্রী সি পি যোশী এবং রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশনের ভারপ্রাপ্ত মানব সম্পদ উন্নয়ণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীমতী পুরণদেশ্বরী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অথচ মানব সম্পদ উন্নয়ণ দপ্তরের একজন বরিষ্ঠ অফিসার

(ওরপর ৪ পতায়)

দেশবিভাগের জন্য জিন্না দায়ী— সিংঘল

প্রেস ক্লাবে সাংবাদিকদের মুখোমুখি অশোক সিংঘল (বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়)।

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। জিন্না নিয়ে যশবন্তের বক্তব্য ভুল। এই সেই জিন্না, যিনি বৃটিশ শাসকদের সঙ্গে একইভাবে দেশবিভাগের জন্য দায়ী। এইরকম একজন লোকের গুণ আমরা কিভাবে গাইতে পারি? গত ২৪ আগস্ট কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সভাপতি অশোক সিংঘল। তিনি আরও বলেন, 'এদেশের শাসক দল তথা সরকার হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাসকেই বিনষ্ট করতে চাইছে। তারা ভারতীয় সংস্কৃতির মূলকেই উপড়ে ফেলতে উদ্যত। সেজন্যই তারা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে হলফনামা দায়ের করে বলেছে, রামচন্দ্রের কোনও অস্তিত্বই ছিল না। সরকার রামচন্দ্র নির্মিত রামসেতু ধ্বংস করতে উদ্যত। সরকারের এই পদক্ষেপের ফলেই ধর্ম ও সমাজ রক্ষার জন্য সাধু-সন্তদের উদ্যোগে গঠিত হয়েছে ধর্ম রক্ষা মঞ্চ। এদেশের এবং বিদেশে বসবাসকারী কোটি

(ওরপর ৪ পতায়)

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!

SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।

যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।

যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –

Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221

SBI Life INSURANCE
With Us, Your's Sure

সাক্ষাৎকারঃ মোহনরাও ভাগবত

হিন্দুত্ব হলো এক গুচ্ছ মূল্যবোধ, এক বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী

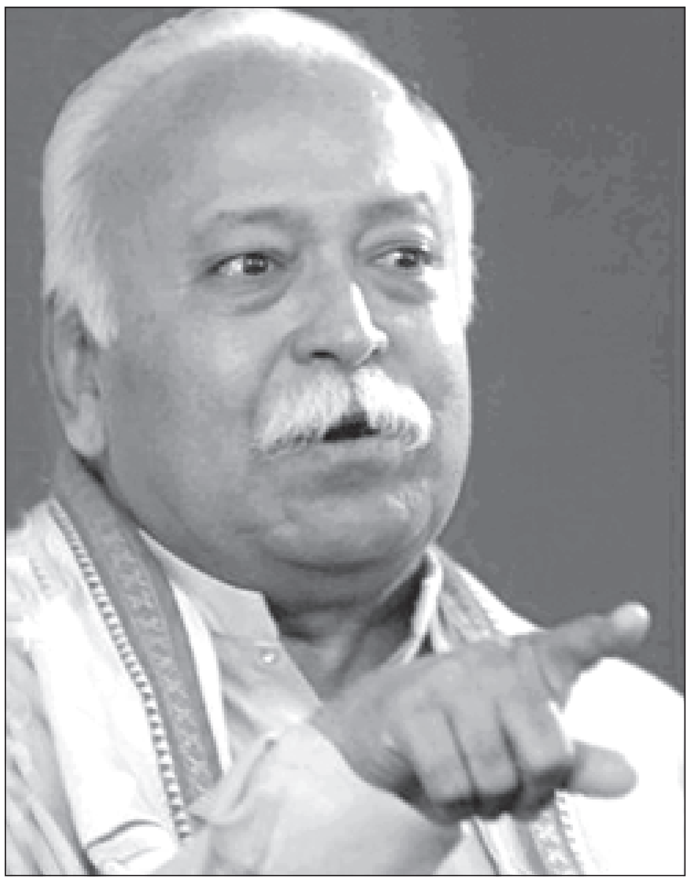

“আর এস এস সব কিছু পরিবর্তনের পক্ষপাতী। কেবলমাত্র হিন্দুস্থান এবং হিন্দুরাষ্ট্র ছাড়া। কিন্তু এই পরিবর্তনের ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব একটা পদ্ধতি রয়েছে।”

গত ১৮ আগস্ট রাত ৮-৩০ মি, 'টাইমস নাও' চ্যানেল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-এর সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত-এর একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করে। "ফ্র্যাংকলি স্পীকিং" নামে ওই সাক্ষাৎকারটি চ্যানেলের পক্ষে গ্রহণ করেন অর্ণব গোস্বামী। সাক্ষাৎকারটি পরে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বহুলভাবে প্রচারিত ও চর্চিত হয়। সেই সাক্ষাৎকারটি এখানে পুরোপুরি প্রকাশ করা হল।

— সঃ স্বঃ

❒ আর এস এসের সভাপতি অর্থাৎ সরসঙ্ঘচালক হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার পর থেকেই আপনি পরিবর্তনের ওপর জোর দিচ্ছেন। আপনি বারবার বলেছেন, আপনার সংগঠন দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে, এমনকী নেতাদের পর্যন্ত। 'পরিবর্তন' এই শব্দটা আর এস এস-এর কাছে একটা বড় ফ্যাক্টর। তা আপনার কি মনে হয়, এবারের নির্বাচনে জনগণ রায় দিয়েছেন যে পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে;শুধু বিজেপির ক্ষেত্রেই নয়, সঙ্ঘের ক্ষেত্রেও।

● পরিবর্তন করা আর এস এস-এর বৈশিষ্ট্য। এটা আমরা ১৯৩৯ সাল থেকেই বজায় রেখেছি। সুতরাং আর এস এস পরিবর্তনশীল নয় — এই প্রচারটা ভ্রান্ত ধারণা। আমরা পরিবর্তন করার ব্যাপারে খুব দৃঢ় সংগঠন। তবে কিছু ক্ষেত্রে, যেটা খুব দ্রুততার সঙ্গে করা দরকার, তার পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন নেই। তবে কোন জিনিসটা পরিবর্তন করব? আর এস এস সব কিছু পরিবর্তনের পক্ষপাতী। কেবলমাত্র 'হিন্দুস্থান হিন্দুরাষ্ট্র' ছাড়া। কিন্তু এই পরিবর্তনের ব্যাপারে আমাদের নিজস্ব একটা পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমে এর জন্য আমরা সহমত তৈরির চেষ্টা করি। এবং সেটা যদি একবার তৈরী হয়ে যায় তবে জরুরী পরিবর্তন করা সম্ভব।

❒ ২০০৪-এর নির্বাচনের সময় আর এস এস বিজেপির সম্বন্ধে প্রভূত ব্যাখা দিয়েছিল যার জন্য হিন্দুত্বের ব্যাপারটা অনেকটা লঘু হয়ে যায়। হিন্দুত্বের আদর্শটাও যে কারণে বেশ লঘু হয়ে গেছিল। অটল বিহারী বাজপেয়ী এই ব্যাপারে একবার গুজরাত দাঙ্গার কথা উল্লেখ করেছিলেন। তখন আর এস এস মোদীর ওপর নির্ভর করছিল, বিজেপিও মোদীর ওপর নির্ভর করেছিল, বাজপেয়ী অপ্রস্তুত হয়েছিলেন। আমার প্রশ্নটা খুব সোজা। আমাদের দেশের জনগণের কাছে 'রাজনৈতিক হিন্দুত্বের ব্রান্ড'টা কি আবার বর্জিত হলো বলে আপনার মনে হয়?

● এটা রাজনৈতিক দলের ভাবনা-চিন্তা করার বিষয়, আমাদের নয়। আমাদের হিন্দুত্ব কোনও ব্রান্ড নয়। আমাদের হিন্দুত্ব হলো, একগুচ্ছ মূল্যবোধ (আ সেট অব্ ভ্যালুজ)। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য। কৃতজ্ঞতা, সংযম, সরলতা — এই ধরনের মূল্যবোধই হিন্দুত্ব। যা কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়। এটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সবকিছুর সঙ্গে জড়িত। সুতরাং হিন্দুত্বকে নির্দিষ্টভাবে কোনও ধর্ম বা বাণিজ্য — এরকম কিছু বলা যাবে না। এটা (হিন্দুত্ব) হলো এক বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী।

❒ কিন্তু 'হিন্দুত্ব'কে তো আজকের দিনে একটা রাজনৈতিক মোড়কের মধ্যে অবশ্যই প্রয়োজন। আপনি বলছেন, হিন্দুত্ব হলো জীবনপথের পাথেয়। কিন্তু এটাকে ব্রত করে হিন্দুত্ব যে বর্তমানে একটা রাজনৈতিক স্লোগানে পরিণত হয়েছে — এটা আপনি মানেন কি? আমার প্রশ্নটা এই, আপনি কি মনে করছেন, হিন্দুত্বের এই স্লোগানকে একদা রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল? যেমন, বিজেপি'র কথাই ধরুন।

● আমি এই 'রাজনৈতিক স্লোগানে'র কথা উল্লেখ করেছি। হিন্দুত্বকে রাজনীতির সঙ্গে জড়ানো হয়েছিল কিনা বা হচ্ছে কিনা — এই ব্যাপারটা অনেকগুলি ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করে। যেমন আপনি কেমন করে এই স্লোগানটা উপস্থাপিত করছেন, পরিস্থিতি কিরকম আছে ইত্যাদি। সেই কারণে কিছু সময় এরকম হয়, তার কারণও থাকে। কিন্তু আমরা হিন্দুত্বকে কখনই কোনও রাজনৈতিক স্লোগান বা রাজনৈতিক আদর্শ বলে গণ্য করি না। আমরা মনে করি হিন্দুত্ব হলো; জীবনের লক্ষণ, জাতীয় জীবনের পরিচয়জ্ঞাপক। বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য।

❒ এখন হিন্দুত্বকে অতিশয় গোঁড়ামির মাধ্যমে উপস্থাপিত করা হচ্ছে বা ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। বিশেষ করে বিজেপির একটা বড় অংশের দ্বারাই এমনটা হচ্ছে। এটাই মনে হচ্ছে যে, হিন্দুত্বের রাজনৈতিক ভাষান্তর যা প্রয়োগ করার চেষ্টা করে একটা রাজনৈতিক দল কেবল অসহিষ্ণুতাই প্রদর্শন করে চলেছে। আপনি কি এই কথাটা অস্বীকার করবেন যে, বিজেপি রাজনৈতিকভাবে হিন্দুত্বকে কাজে লাগাচ্ছে না?

● বিজেপি এটা নিয়ে ভাবুক। আমরা মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই। আমরা আমাদের বক্তব্য সমাজের কাছে তুলে ধরব। আপনার অভিজ্ঞতাটা আপনার একটা ধারণা হতে পারে। কিন্তু এটা জেনে রাখুন, যে মুক্তমনা, সেই আমাদের কাছে স্বাগত। একবার নাগপুরের এক মুসলিম স্কলার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করেছি, তিনিও আমাদের বিশ্বাস করেছেন। আমাদের মধ্যে মত-বিনিময়ও হলো। হিন্দুত্ব নিয়ে তার মনে কোনও ভুল ধারণা ছিল না। সুতরাং এই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তাটা ....।

❒ আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে, যখন বিজেপি হিন্দুত্ব নিয়ে ব্যাখ্যা করে তখন তারা ভুল বলে। আপনি জীবনেও কল্পনা করতে পারবেন যে বিজেপি 'হিন্দুত্ব'কে এমনভাবে গণ্য করে যাতে মনে হয়, 'হিন্দুত্ব' বলে বিষয়টা যেন কোনও 'থিমের' আওতায় পড়ছে। যেমন ধরুন — বাবরি মসজিদ ধ্বংস, রামমন্দির ইস্যু, ৩৭০ ধারা, অভিন্ন দেওয়ানী বিধি। এগুলো মনে হয় রাজনৈতিকভাবে হিন্দুত্ব সম্পর্কে সঙ্কীর্ণ মনের চিন্তা। আপনি কি এই বিষয়ে সহমত হবেন যে হিন্দুত্ব সম্পর্কে এ ধরনের ব্যাখ্যা জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি?

● এই যে বিষয়টা বললেন অর্থাৎ ৩৭০ ধারা;এটা হিন্দুত্বের সঙ্গে মোটেও সংশ্লিষ্ট নয়, বরং এই বিষয়টা আমাদের জাতীয় সংহতির জন্যেই একান্তভাবে প্রয়োজনীয়। আপনি বললেন রামজন্মভূমির কথা। এটা রামমন্দিরের প্রশ্ন নয়। এই মন্দিরটি এক সময় বহিরাগত আক্রমণকারীদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। এখন আমরা স্বাধীন। সুতরাং এই জাতীয় গর্বের প্রতীকটিকে আমরা পুনরুদ্ধার করতেই পারি। এটা হিন্দু-মুসলিম এইরকম কোনও বিষয় নয়, এটা জাতীয় গর্বের প্রতীক। এখানে সেই মূল্যবোধটুকু হল, একমাত্র ভারতবর্ষ। মুসলমানদের ভারত, খৃস্টানদের ভারত, তথাকথিত হিন্দুদের ভারত। এরা সবাই একই সংস্কৃতির অন্তর্গত।

❒ কিন্তু মি. ভাগবত, এই ধরনের ভাবনা-চিন্তা সবসময় করা হয় না। তবে এটা ঠিক, এই ধরনের ভাবনাই যথাযথ। যাই হোক, লোকে বলছে বিজেপি তার নিজের কাজের জন্যেই একটা ধর্মমতের ফাঁদে আটকা পড়েছে। সাধারণ লোকে একথাও বলছে, কংগ্রেস যেখানে যুব-সমাজের কাছে পৌঁছতে মরিয়া, তখন বিজেপি এই ব্যাপারে নিস্পৃহ। তাই এর জন্য প্রয়োজন পরিবর্তন।

● বিজেপি ভাবুক এনিয়ে। আপনি আমায় তখন থেকে শুধু বিজেপির সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন! আমি তো আর এস এস-এর সরসঙ্ঘচালক। বিজেপি এগুলো নিয়ে ভাবুক — যে কেমন করে তারা হিন্দুত্বের ব্যাখ্যা করবে না কি করবে....

❒ আমি বুঝতে পারছি যে আপনি বিজেপির সম্বন্ধে কথা বলতে চাইছেন না। কিন্তু আমায় বলুন, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরের দিন; খোলাখুলি ভাবে, আন্তরিকভাবেই বলবেন ....

● (হেসে) আমি আন্তরিকভাবে, খোলাখুলিভাবেই সবকিছু বলছি....

❒ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরের দিন যখন আপনার সঙ্গে এল কে আদবানীর দেখা হলো, আপনি কি তাঁকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন?

● আপনার জ্ঞাতার্থে জানাই, আমি সেখানে ছিলাম না। আমি তখন সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে ছিলাম। আমাদের তিনজন অধিকারী, যেহেতু আদবানীজি পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন তাই তাঁরা, তাঁর (আদবানীর) সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন। কারণ তিনিও আমাদের স্বয়ংসেবক। তিনি শুধু বিজেপি'র সর্বোচ্চ নেতাই নন, তিনি একজন স্বয়ংসেবকও। সেই কারণে তাঁরা দেখা করেছিলেন আদবানীজির সঙ্গে।

❒ আপনি তাঁকে (আদবানী) তখন পদত্যাগ করতে বারণ করেছিলেন?

● না।

❒ ঠিক আছে, আমাকে বলুন আর এস এস নেতৃত্ব কি তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেছিলেন?

● কখনই না। আমরা মোটেই তাঁকে পদত্যাগ করতে বলিনি। আদবানীজি নিজেও বলেছেন, এটা তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। যখন একটা রাজনৈতিক দলের নেতা, যিনি একজন স্বয়ংসেবকও, এরকম পরিস্থিতিতে পড়েন;আমি মনে করি তখন তাঁর পাশে ....

❒ কিন্তু সমগ্র সংবাদমাধ্যম এটাই বলছিল, যেহেতু আদবানী নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই বলেছিলেন, তিনি কোনও পদ আঁকড়ে থাকতে চান না। আপনি এই কথাটা স্মরণ করতে পারছেন?

● অবশ্যই।

❒ ঠিক এর পরেই আর এস এস-এর তিনজন নেতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং এটাই মনে করা হচ্ছে, তাঁরা (আর এস এস-এর তিনজন অধিকারী) তাঁকে স্ব-পদে বহাল থাকার জন্য প্রভাবিত করে।

● এটা আর এস এস-এর বিষয় নয়। আদবানীজী আমাকে বলেছিলেন .....। গত জুন মাসে দিল্লী হয়ে যাবার সময় আদবানীজি আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, আমি দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেব। কিন্তু তারপরে আমরা সহকর্মীসম রাজনৈতিক দলটির কিছু সদস্য আমার কাছে আসেন এবং তাঁরা বলেন, আদবানীজিকে একটা সময়ে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এখন যদি তিনি দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যান সেটা কি ভালো দেখাবে? আমার মনে হলো কথাটা যুক্তিসঙ্গত এবং এনিয়ে পুনরায় ভাবনা-চিন্তা করার দরকারও রয়েছে। সেই কারণে আমি তাঁকে পদত্যাগ না করতে অনুরোধ করি। কিন্তু এভাবে তো মিডিয়া বলছে না? এটা বলুন।

❒ আপনি বলছেন, এই সিদ্ধান্ত আদবানীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু সংবাদমাধ্যম বলছে, আর এস এস-এর ওই তিন নেতা গিয়ে তাঁকে বোঝানোর পরেই এটা সম্ভব হয়েছে।

● না, না। একেবারেই তা না।

❒ কিন্তু একটা সমালোচনা হচ্ছে যে বিজেপির হয়ে এবারে নির্বাচনী প্রচারে নেমেছিল আর এস এস-এর মুখপত্রগুলি।

(এরপর ১৩ পাতায়)

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ এক প্রশাসনহীন রাজ্য

বামপন্থীর নান্য-পন্থা। বামপন্থী শৌখিন কমরেডগণ আজ সমাজের সর্বস্তরে কেমন যেন ভোল বদলাইয়া নিছক বাবু মশায় সাজিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সভা সমাবেশ তো বটেই, এমনকী পার্টি এবং পার্টির গন্ধ মাখা বেনামী ক্লাব সমিতিকেও ইহারা এড়াইয়া চলিতে তৎপর। একেবারে নীচের তলার নেংটি ইঁদুরের দল জাহাজ বদলাইতে শুরু করিয়াছে। দুঃসময় আসিলে এমনই হয়। সবচেয়ে প্রথমে জাহাজ ত্যাগ করে বুদ্ধি জীবীগণই। তাহাদের সাথে সাথে লাফ মারে দলের লুম্পেনরা — যারাই অনুকূল স্রোতে ভাসিতে ভালবাসে। বাকি রহিল শ্রমিক-কৃষক। শিল্পহীন পশ্চি মবঙ্গে সি পি এম দলে আজ শ্রমিক বলিতে প্রায় কিছুই নাই। আর কৃষি জমি জোর করিয়া দখল করিতে গিয়া আজ কৃষকরাও বিমুখ।

এহেন অবস্থায় ক্ষমতাসীন দলীয় নেতৃবৃন্দের অবস্থাই হয় সবচেয়ে করুণ। মন্ত্রীগণ তো বটেই, এমনকী মুখ্যমন্ত্রীও আজ বড় অসহায়। মুখ্যমন্ত্রীর সভায় সেই ভড়- ভড়ন্ত ভীড়ও নাই, আর না বুঝিয়া, না শুনিয়া ছুতো-নাতায় হাততালিও নাই। বিগলিত মুখ্যমন্ত্রীর কথায় কথায় কবিতা আওড়ানোও নাই। "এখনই করিতে হইবে" — গোছের উপদেশমূলক কথামৃত দানও আজ অপাত্রে দান হইয়া পড়িতেছে। উদ্বেলিত প্রজাহীন রাজার এ যে কী বেদনাদায়ক মুহূর্ত তাহা রাজাই জানে। সেই মুহুর্মুহু করতালিও নাই, নামের জয়গানও নাই।

একাকী বুদ্ধ কে লইয়া আজ দলেই চলিতেছে ঠাট্টা ইয়ার্কি ও রটনা। দশদিন তিনি তাঁহার দপ্তরেই আসেন নাই। কেন আসেন নাই? সরকারি মতে তাহার এই অনুপস্থিতির কারণ অসুস্থতা। কিন্তু তাহার দলেরই কেউ কেউ রহস্য করিয়া বলিতেছে "জানি জানি, তাহার কি অসুখ"। ইতিমধ্যেই তাহার ডানা ছাঁটিবার প্রক্রিয়া শুরুও হইয়া গিয়াছে। শোনা যাইতেছে, তাহাকে ভার মুক্ত করিবার নামে একজন 'উপ-মুখ্যমন্ত্রী' পদ নাকি সৃষ্টি করিবার পরিকল্পনাও দল গ্রহণ করিয়াছে। দল তাহাকে ঠারে-ঠোরে বুঝাইয়াও দিয়াছে যে দলে তাহার মতো আরও নেতা এখনও বিদ্যমান। তাই তিনি যেন মনে না করেন যে, তিনি দলে একজন অপরিহার্য ব্যক্তি।

কিন্তু বামপন্থী নেতারাও, যে রাজ্যেরই হউক, কিংবা জাতীয় স্তরেরই হউক, আজ জনগণ বিচ্ছিন্ন। শ্রমিক-কৃষক বিচ্ছিন্ন। তাহাদের আস্ফালন আর জনগণ শুনিতে প্রস্তুত নহে। গ্রামে গ্রামে আজ তাই পাল্টা মারের মহড়া শুরু হইয়াছে। "কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মত"। হিম্মত নাই, তাই আজ তাহাদের কাঁদুনিই একমাত্র অবলম্বন হইয়াছে, আজ কোথাও কিছু ঘটিলেও প্রশাসন যেন ঠুঁটো হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। রাজারহাটের ঘটনায় একজন মুসলমান নিহত হইয়াছে। পরিণামে পাড়ার সহস্রাধিক মুসলমান যুবক অস্ত্র-শস্ত্র ও মশাল লইয়া আসিয়া তিন ঘন্টা ধরিয়া বৈদিক ভিলেজে অগ্নি সংযোগ ও লুঠ-তরাজ চালাইয়াছে। রাজারহাটে কি পুলিশ থানা নাই? থাকিলে সেই থানা কত দূরে ছিল? সেখান হইতে আসিতে কি তিন ঘন্টা লাগিবার কথা? কেন লাগিল? এখানেই শেষ নয়। বৈদিক ভিলেজ হইতে তল্লাসির ফলে উদ্ধার হইয়াছে অস্ত্র এবং পুলিশের হেলমেট। পুলিশ সেজে রাতের অন্ধকারে জমি দখলের অপারেশন চালাত গফ্‌ফর মোল্লার হার্মাদ বাহিনী। উল্লেখ্য, কয়েক মাস আগে রাজারহাট থেকে উদ্ধার করা অস্ত্র ভাণ্ডার নানা অত্যাধুনিক অস্ত্রের সঙ্গেই বুলেট প্রুফ জ্যাকেট উদ্ধার করেছিল সি আই ডি।

সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, মঙ্গলকোট একটার পর একটা ঘটনা ঘটিয়া চলিয়াছে। পশ্চি মবঙ্গের আজ এই হাল! অভিভাবকহীন? প্রশাসনহীন এক রাজ্য।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

সমগ্র ভারতীয় মনীষীবৃন্দ প্রাদেশিক ভাষাভেদ আচার ব্যবহারের বৈচিত্র্য এবং রুচি ও জীবনযাত্রা প্রণালীর বৈরূপ্যকে দমিত করে, এক ভাষার সেবা করে, ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক একতার সভ্যতা প্রমাণিত করেছিলেন। সেই ভাষা সংস্কৃত ভাষা। বাঙালী নব্য ন্যায় ও নব্য স্মৃতি রচনা করেছেন সংস্কৃত ভাষায়;মহারাষ্ট্রীয়গণ ব্যাকরণ, স্মৃতি, মীমাংসা শাস্ত্রের নবীন শৈলীর উদ্ভাবন করেছিলেন, এই ভাষার সাহায্যেই ;এই ভাষাকে অবলম্বন করেই বৌদ্ধ ও জৈন আচার্যগণ ভগবান শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধব, বল্লভ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁদের দর্শন ও ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। নানা দেশের কবিগণ যখন সমগ্র ভারতবাসীর কল্যাণ ও আনন্দ বিধানের জন্য কাব্য রচনা করেন তখন এই ভাষাই তাঁদের উপজীব্য ছিল। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন অপভ্রংশ প্রাকৃতের প্রচলন অব্যাহত রেখেও সমগ্র ভারতবর্ষের উন্নত শিক্ষার বাহন ছিল এই এক সংস্কৃত ভাষা। কেবল ধর্মকার্যেই না, লৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মাধিকরণের বিচার-ব্যবস্থার এবং ক্রয়-বিক্রয়, পণ বন্ধাদির সাধনও ছিল এই সংস্কৃত ভাষা।এই ভাষার অনুশীলন করে এবং এই ভাষায় রচিত ঋষি ও আচার্যগণের প্রচারিত শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করে ভারতবর্ষ তার একাত্মতা ফিরে পেয়েছিল।

ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। প্রবন্ধ ভারতের ঐক্য সাধনার সুর।

হিন্দু যদি হিন্দু না হন, রাখবেন তারে কোন ভগবান?

শিবপ্রসাদ লোধ

ভারতের ভাগ্যাকাশে যে কালো মেঘ ক্রমশ ঘনীভূত হচ্ছে, এদেশে হিন্দুবিদ্বেষী শক্তি গুলো প্রচন্ড রকমের প্রচারশীল, সংগঠিত ও অনুশাসিত। হিন্দুদের মতো এদের মগজ ধোলাই করা যায় না। বরং এরা বিভিন্ন দলে কৌশলী অনুপ্রবেশ চালিয়ে বিরুদ্ধ মতকে নিজের মতে পরিবর্তিত করতে পারঙ্গম। এদের নেতা ও বুদ্ধি জীবীগণ নিজ স্বার্থে সতত সক্রিয়। বিরোধিতার মুখোমুখি এদের হতে হয় না। বরং বিভিন্ন দিক থেকে এরা প্রশ্রয় পান। অপরদিকে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতার শিকার হওয়া অনুশাসন লঙ্ঘনকারী হিন্দু সমাজের মানুষ স্বীয় স্বার্থে সমষ্টিগত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন, আক্রমণের মুখে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিবর্তে পালানোর পথ খোঁজেন।

ঘটনা ১ : এতো গেল বিড়ম্বনার একদিক। এবার আসছি অধ্যাত্ম আশ্রিত মানুষের মধ্যেই রয়েছে। এই বার্তা যিনি ত্রিতাপদগ্ধ মানুষের কাছে বহন করে আনেন ও মূলে পৌঁছোনোর পথ দেখিয়ে দেন তিনিই গুরুদেব। চলমান জগতে, জীবনকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার মধ্য দিয়ে সত্যে, কি করে অবিচল থাকা যায় এই পথ নির্দেশ যিনি দেন তিনি ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, তিনি কুরুক্ষেত্রের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। আমরা নানাভাবে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা মানুষ, আমাদের সমাজ আছে, সংসার আছে, শত্রু আছে, মিত্র আছে। রাজনীতি আছে, ধর্মীয় পরিচয় আছে। যতদিন আমরা মানুষ, ততদিন নিজের পরিচয়কে শক্ত করে ধরে রাখার কর্তব্যও আমাদের রয়েছে। ধর্ম কোনও অন্ধবিশ্বাসের উপর নির্ভর করা নয়। প্র্যাকটিকাল ক্লাশ। যা গড-ল্যাবে ঢুকেই অনুশীলন করা যায়। যার যে ধর্ম ভালো লাগে সে তা পালন করবে এটা শ্রুতিমধুর বাক্য, স্বধর্ম বিচ্যুতির কথা না ভেবে এসব নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন? খৃস্টান, মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের তো এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখি না। ওঁরা ওদের মতো আছেন। ধর্ম রাজনীতি দু'টোকে পাশাপাশি রেখে আধিপত্য বজায় রেখে চলেছেন। আপনার পায়ের তলা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। কোথায় দাঁড়িয়ে আপনি মানব প্রেমের কথা বলবেন? ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে? ধর্ম যদি ঘরের চৌহদ্দিতেই হয়, তবে প্রচারপত্র বিলি করতে বেরিয়েছেন কেন? তাও আবার মহেশ্বরের নামে? আমার কথা সম্পাদক ভদ্রলোকের পছন্দ হয়নি। তিনি আমাকে পড়ে দেখতে বলে পিঠটান দিলেন।

ঘটনা ৩ : রাজনৈতিক দলের একজন বলিষ্ঠ নেতা বক্তৃতা দিচ্ছেন — এখানে অনেক মা-বোনেরা রয়েছেন। আপনারা সকালে উঠে সূর্য প্রণাম করেন ঠাকুর ঘরে

> **"শ্রীরামকৃষ্ণদেব সব রকমের সাধনা করেছেন। কিন্তু খুঁটি করে রেখেছেন মা কালীকে, আমরা সর্বধর্ম সমন্বয় নিয়ে খুব প্রচার করি কিন্তু নিজ ধর্মের উপর দৃঢ় অবস্থানের যে শিক্ষা তিনি দিয়েছেন সেটা ইচ্ছে করেই ভুলে যাই। তাই, সংখ্যা গুরু হয়েও হিন্দুরা অবহেলিত, লাঞ্ছিত, ক্ষমতা থেকেও এঁরা ক্ষমতাহীন। হিন্দু যদি হিন্দু না হয়, রাখবেন তারে কোন ভগবান?"**

কূর্মবৃত্তি প্রসঙ্গে। এ সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা থেকে দু-চার কথা লিখছি। মাস কয়েক আগের কথা, একটি হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে একটি সর্বধর্ম-সভা পরিচালনা করার জন্য আমাকে অনুরোধ জানানো হল। হিন্দু-মুসলমান খৃস্টান, বৌদ্ধ, শিখ প্রতিনিধিগণ সেই সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং আলোচনায় অংশ নেবেন। সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ নাকি তাদের উদ্দেশ্য। বললাম এটি তো সুন্দর প্রস্তাব। তবে হিন্দু প্রধান এলাকায় এ ধরনের অনুষ্ঠান সংগঠিত করার চেয়ে যদি, অহিন্দু এলাকায় এ ধরনের সভা অর্গানাইজ করা যায় তবে আমার মনে হয় এর উপযোগিতা অনেক বেড়ে যাবে। উদ্যোক্তা বললেন — অহিন্দু এলাকায় এ ধরনের সভা করার অনেক ঝামেলা। তেমন সাড়াও পাওয়া যায় না।

যাই হোক, যথাসময়ে সভা অনুষ্ঠিত হ'ল, পাদ্রী ও মৌলবীগণ তাদের ধর্মশাস্ত্র ঘেঁটে ভালো ভালো কথা শোনালেন। স্ব-ধর্মের জয়গান গাইলেন। তাদের ধর্ম যে কতো অসাম্প্রদায়িক, তার উদাহরণ তুলে ধরলেন। শুনলেন কয়েকশো হিন্দু শ্রোতা, যার অধিকাংশই ছিলেন মহিলা।

পরিচালনার ভার থাকায় সমাপ্তি ভাষণ আমাকে দিতে হলো। বলালম — হিন্দু ধর্মের আল্টি মেট রিয়েলিটি হচ্ছে, যে কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রাপসারী গতিতে জীব বিচ্যুত হয়ে মনুষ্যজীবন ভোগ করছে। একদিন তাকে কেন্দ্রাভিসারী গতিতে সেই মূলে পৌঁছোতে হবে। মানুষ না থাকলে যেমন ঈশ্বর থাকে না, তেমনি ঈশ্বর না থাকলে মানুষ থাকে না, মানুষই ভগবান হতে পারেন, সমস্ত শক্তি

কিন্তু এর ফলটা ক্ষতিকর। কারণ, এর ফলে সমাজ সংসার, রাজনীতি, সেকুলারিজম কিছুই থাকে না। এটা খৃস্টান মুসলমানরা বোঝেন, শুধু হিন্দুরাই বোঝেন না।

বলা বাহুল্য, উদ্যোক্তারা আমার বক্তব্যে প্রসন্ন হননি, তাঁদের যুক্তি মত ও পথ হয়তো আলাদা। কিন্তু সকালে একেরই উপাসক। বলতে বাধ্য হলাম কুমোরপোকার কথা ভাবতে ভাবতে আরশোলা কুমোরপোকা হয়ে যাওয়ার কৌশলটা হিন্দু ধর্মই জানে। এটা একের উপাসনা নয়, নিজেকে জানার অর্থাৎ একত্বের উপাসনা। সুতরাং তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম, আমার জন্য আমার ধর্ম। এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটলে সাম্প্রদায়িকতা থাকে না। কারণ, তখন আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্খাও থাকে না।

ঘটনা ২ : আজ থেকে ১৫/২০ দিন আগের কথা। অপর একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক আমার হাতে একটি প্রচারপত্র ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "আমি একজন মানবধর্ম প্রেমী মানব। আমার মতে হিংসা পরম অধর্ম। দু-দিনের জন্য এসে মানুষের সাথে যথা সম্ভব প্রেম-প্রীতি বজায় রাখাই মানবধর্ম। ধর্ম আলাদা আলাদা হলেও মাটি একটিই। সুতরাং হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ না মেনে পরিবেশের উপর গুরুত্ব দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত, ধর্ম নেই একথা ভুল। ধর্ম নিজের বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে। অমি বুঝি মানুষের কর্মই ধর্ম।" প্রসঙ্গত, প্রচারপত্রটির উপরে লেখা-'ওঁ গুরুদেব মহেশ্বর'।

আমি সম্পাদক ভদ্রলোককে বললাম, বেশ ভালো কথা লিখেছেন। কিন্তু, আমাকে একটা কথার জবাব দিতে পারেন? আপনার

গিয়ে প্রার্থনা করেন — আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। অর্থাৎ, ভগবানের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করেন। ভগবানকে অনেকেই মানেন। ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত। আজ হিন্দুত্ববাদীরা এই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছে। মানুষে মানুষে ভেদ সৃষ্টি করছে কারা! আপনাদের কাছে অনুরোধ ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে মেশাবেন না, যারা মেশায় তাদের প্রশ্রয় দেবেন না। (চোরের মায়ের বড় গলা?)।

সমাজের গভীরে প্রতিদিন, এ ধরনের মগজ ধোলাই চলছে। যার পরিণতিতে হিন্দুরা বিভ্রান্ত লক্ষ্যশূন্য হয়ে পড়ছেন। একদিকে রাজনৈতিক আক্রমণ, অপরদিকে স্ব-সৃষ্টে বিভ্রান্তি, মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোথায়? পাড়ায় পাড়ায় শনিদেব, শীতলামাতা, কালীমাতা বিরাজিত। বৈষ্ণব, গুরুবাদী, শৈব, শাক্ত, যোগী, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী সবাই আছেন, কেবল মূলটাই নেই — হিন্দুত্ব। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সব রকমের সাধনা করেছেন। কিন্তু খুঁটি করে রেখেছেন মা কালীকে, আমরা সর্বধর্ম সমন্বয় নিয়ে খুব প্রচার করি কিন্তু নিজ ধর্মের উপর দৃঢ় অবস্থানের যে শিক্ষা তিনি দিয়েছেন সেটা ইচ্ছে করেই ভুলে যাই। তাই, সংখ্যা গুরু হয়েও হিন্দুরা অবহেলিত, লাঞ্ছিত, ক্ষমতা থেকেও এঁরা ক্ষমতাহীন। হিন্দু যদি হিন্দু না হয়, রাখবেন তারে কোন ভগবান?

বাতিল গাড়ির বেকারদের কর্মসংস্থান করতে হবে রাজ্যকে — বি এম এস

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আমাদের কাজের ভিত্তি হল আমাদের আদর্শবাদ। এজন্যই একসঙ্গে কাজ করি। আমাদের বিচারধারা হলো একাত্ম মানববাদ বা হিন্দুত্ব। পৃথিবীর অন্যান্য সকল চিন্তাধারাই অসম্পূর্ণ — তাতে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সম্ভব নয় — এটা আজ স্পষ্ট। আমাদের নতুন কার্যকর্তা তৈরি করা, নতুন যুবক কার্যকর্তাদের ধীরে ধীরে সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন। তাদের গুণমান বৃদ্ধি এবং দোষ দূর করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। 'মত অনেক কিন্তু নির্ণয় এক' — তাই মেনে সকলকে সমবেতভাবে কাজ করতে হবে। কেউ দোষ দেখিয়ে দিলে তাকে সঠিক স্পিরিটে গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তি নয়, সংগঠন ও সামূহিক কর্মপ্রচেষ্টার ফলেই ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যাবে। তাই বলে আমরা দত্তোপন্তজী বা বড়ো ভাই রামনরেশজী-র প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করব না, তাও ঠিক নয়।

উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় প্রচারক প্রমুখ মদনদাসজী। তিনি কলকাতায় ভারতের সর্ববৃহৎ শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের (বি এম এস) কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির তিনদিন ব্যাপী বৈঠকের সমাপ্তি অধিবেশনে কথাগুলি বলেন। তাঁর পাশে উপবিষ্ট ছিলেন বি এম এস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি গিরীশ অবস্থি এবং সাধারণ সম্পাদক কে লক্ষ্মা রেড্ডি। তিনদিনের জাতীয় কর্মসমিতির এই বৈঠকে সারা দেশ থেকে একশজনেরও বেশি কার্যকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে জাতীয় কর্মসমিতি চারটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। প্রথম প্রস্তাবে ্বখ থেকে ভারত সরকারকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, এবার ভারতের রাজধানী দিল্লীতে আগামী মাসে ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের কনফারেন্স হতে চলেছে। তার আগেই বি এম এস দিল্লীতে বিশাল বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অন্ততপক্ষে পঞ্চাশ হাজার শ্রমিক আগামী ২ সেপ্টেম্বর রাজধানীতে ্বখ-র বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাবেন।

সেকথাই তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কে লক্ষ্মা রেড্ডি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই কেন্দ্রীয় সম্পাদক বৈজনাথ রায় এবং অশ্বিনী রানা। চতুর্থ প্রস্তাবে — ১৫ বছরের পুরনো গাড়ি আদালতের নির্দেশে বাতিল করার ফলে পশ্চিমবঙ্গে যে লক্ষ লক্ষ কর্মচারী বেকার হয়ে পড়েছে, তাদের জন্য

কলকাতায় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির বৈঠক।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য 'সামাজিক নিরাপত্তা তহবিল' গঠনের দাবী করা হয়েছে। এজন্য সামাজিক নিরাপত্তা আইনের মাধ্যমে সেন্ট্রাল ওয়েলফেয়ার বোর্ড গঠন করে কেন্দ্রকেই তহবিল-এর ব্যবস্থা করতে হবে। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রেই বিরাট সংখ্যক শ্রমিক কাজ করেন। তাদের কোনও কিছুরই নিরাপত্তা বা গ্যারান্টি নেই।

তৃতীয় প্রস্তাবে কেন্দ্র সরকারের বিলগ্নিকরণ নীতির কড়া সমালোচনা করা হয়েছে। এই প্রস্তাবে লাভে চলা সরকারি সংস্থার শেয়ার বিক্রি করে ব্যক্তিগত হাতে তুলে দেওয়ার কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। গত ১৮ আগস্ট সাংবাদিক সম্মেলনে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বুদ্ধদেব সরকারকে করতে হবে এবং অন্যথায় তাদেরকে ভাতা দেওয়ার দাবী জানানো হয়েছে। এজন্য বি এম এস আগামী ৩১ আগস্ট থেকে আন্দোলনে নামবে বলে জানিয়ে দিয়েছে।

বৈঠকের শেষে ১৯ আগস্ট আগত প্রতিনিধিরা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং অন্যান্য কয়েকটি সমমনোভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রদেশ ও ক্ষেত্র স্তরের কার্যকর্তাদের সঙ্গে এক অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে পরিচিত হন।

দেশ বিভাগের জন্য জিন্না দায়ী

(১ পাতার পর)

কোটি হিন্দুরা বিশ্বাস করেন ভগবান রামচন্দ্র ত্রেতাযুগে এদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।'

বস্তুত শ্রীসিংঘল এদিন দু'টি যুগান্তকারী যাত্রার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন। একটি হল ভগবান শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পাঁচশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কাটোয়া থেকে পুরী পর্যন্ত মহাসংকীর্তন যাত্রা। সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে পথে পায়ে হেঁটে কাটোয়া থেকে পুরীতে গিয়েছিলেন, এখন পাঁচশ বছর বাদে সেই একই পথে 'শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত হরিনাম প্রচার সমিতি' এই যাত্রার আয়োজন করেছে। শ্রীচৈতন্যের অনুগামী বিভিন্ন মঠ-আশ্রম ও সংস্থার সাধু-সন্ত অন্যান্য ভক্তবৃন্দ এই সমিতিতে আছেন।

সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক হলেন অশোক সিংঘল। শ্রীসিংঘল জানান, ১০ জানুয়ারি কাটোয়া থেকে এই সংকীর্তন যাত্রা শুরু হয়ে ১৪ ফেব্রুয়ারি পুরীতে শেষ হবে। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায় এই যাত্রা সীমিত হলেও সারা দেশেই শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের ৫০০ বছর পূর্তিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে বলে সমিতির অন্যতম কর্মকর্তা বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী জানান। শ্রীসিংঘল বলেন, বিদেশী, বিধর্মী শাসকের বিরুদ্ধে অহিংস সত্যাগ্রহ করে আজ থেকে ৫০০ বছর আগে সফল হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। তাঁর 'হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে' — নামে আজ তো পৃথিবী মাতোয়ারা। সেজন্য দেশে বিদেশে ইসকন-এর (ইন্টারন্যাশন্যাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনশাসনেশ) কাছে কাতারে কাতারে পাশ্চাত্যবাসীরা শান্তি পেতে ছুটে আসছেন বলে শ্রী সিংঘল জানান। এবারের মহাসংকীর্তন যাত্রায় সেই নাম সংকীর্তনের প্লাবনে দেশ-বিদেশ আবার নতুন করে উদ্বেলিত হবে বলে শ্রীসিংঘল মন্তব্য করেন।

একই সঙ্গে শ্রীসিংঘল আরও একটি যাত্রা, বিশ্বমঙ্গল গো-গ্রাম যাত্রার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন। এই যাত্রা বিজয়া দশমীর দিন কুরুক্ষেত্র থেকে শুরু হয়ে সারা দেশের কুড়ি হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করবে। উদ্দেশ্য-গো-রক্ষা, গ্রাম রক্ষার মাধ্যমে কৃষি, কৃষক এবং ভারতরক্ষা। শ্রীসিংঘল আরও বলেন, এই যাত্রার প্রেরণা ও পরিকল্পনাকার গোকর্ণ পীঠাধীশ্বর জগৎগুরু শংকরাচার্য শ্রীশ্রী রাঘবেশ্বর ভারতী মহারাজ যে কাজ করছেন তা আজ পর্যন্ত কেউ করেননি। এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। আক্ষেপের সুরে শ্রীসিংহল বলেন, যে দেশে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোপাল ও গোপালক ছিলেন সে দেশে অবাধে গোহত্যা চলছে। গত দশবছরে অন্ততপক্ষে চারকোটি গো-হত্যা হয়েছে। এই যাত্রায় — 'কসাই-এর হাতে গরু তুলে দেব না। গ্রামে গ্রামে গোচারণ ভূমি চাই' — এজন্য কমপক্ষে চল্লিশ কোটি ভারতবাসী গণস্বাক্ষর করবেন। তিনি আরও বলেন এদেশের গ্রাম গো-প্রজাতির উপর নির্ভরশীল, আমাদের অর্থনীতির জীবনরেখা।

সুপ্রীম কোর্টের সাতজন বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ গো-রক্ষার জন্য আইন প্রণয়নের নির্দেশ দিলেও তা কার্যকর করা হয়নি বলে শ্রী সিংঘল ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নেরও জবাব দেন শ্রীসিংঘল। এক প্রশ্নের উত্তরে অশোকজী এসময়ে দেশের পক্ষে 'বাইবেল ও রাইফেল'-কেই বড় বিপদ বলে জানান। জিহাদ, মাওবাদ ও ধর্মান্তরকরণকেই তিনি দেশ ও সমাজের পক্ষে বিপদ বলে উল্লেখ করেন। প্রসঙ্গত, অশোকজীর সঙ্গে সাংবাদিক সম্মেলনে বিমল লাঠ, অদ্বৈত দাস প্রভু (ইসকন), স্বামী অশোকানন্দ (ভোলাগিরি আশ্রম), বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী (মহানাম মঠ), স্বামী যুক্তানন্দ (ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ) এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আন্তর্জাতিক সহ-সভাপতি বালকৃষ্ণ নাইক উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে পল্লব দে সরকার

সংবাদদাতা ।। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী বিভাগ কার্যবাহ পল্লব দে সরকার গত ১৮ আগস্ট মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতায়

পরলোকে গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫১ বছর। তিনি অকৃতদার ছিলেন। ৮ ভাইয়ের মধ্যে পল্লবদা ছিলেন পঞ্চম। মা ও ৭ ভাই বর্তমান।

তিনি ছিলেন সঙ্ঘের একজন নিষ্ঠাবান স্বয়ংসেবক এবং নীরব ও নির্ভীক কার্যকর্তা। বিবিধ সংগঠন ও বিভিন্ন সামাজিক কাজের সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।

তাঁর প্রিয় তাঁতিবেড়িয়া সঙ্ঘ কার্যালয়ে মরদেহ নিয়ে আসা হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই শতাধিক স্বয়ংসেবক ও মায়েদের উপস্থিতিতে গীতাপাঠ, শান্তি মন্ত্র ও অন্তিম প্রণাম জানানো হয়। সেখান থেকে মরদেহ তাঁর বাসভবন রামচন্দ্রপুরে নিয়ে আসা হয় এবং ওই গ্রামেরই শ্মশানে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সঙ্ঘের ক্ষেত্র প্রচারক সুনীলপদ গোস্বামী, সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকরী মন্ডলের সদস্য জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী, প্রান্ত প্রচারক প্রমুখ প্রদীপ দে প্রমুখ কার্যকর্তারা তাঁর মরদেহে মাল্যার্পণ করেন। তাঁর শেষ যাত্রায় বহু মানুষ যোগ দিয়েছিলেন।

শোক সংবাদ

শ্রীমতী প্রফুল্ল মজুমদার পরলোক গমন করেছেন। গত ২১ আগস্ট সন্ধ্যায় মালদা হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বৎসর। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদারের তিনি মাতৃদেবী। বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। তিনি সাত পুত্র দুই কন্যাসহ নাতি-নাতনীদের রেখে গেছেন। তাঁর পুরো পরিবারই সঙ্ঘময়।

পরলোকে উৎপল চক্রবর্তী

গত ১৮ আগস্ট রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক উৎপল চক্রবর্তী পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বৎসর। বাল্যকাল থেকে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। টালিগঞ্জ ঋষি আশ্রম শাখায় তিনি স্বয়ংসেবক হন (১৯৫৯)। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অ্যাডভোকেট (আয়কর) ছিলেন। জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে কারাবরণ করেন তিনি। পরবর্তীকালে তিনি বিজেপি-তে যোগ দেন। রাজ্য বিজেপি-র যুব মোর্চার প্রেসিডেন্ট হন। যুব মোর্চার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যও ছিলেন। তাঁর সাংগঠনিক কুশলতা ছিল প্রশংসনীয়। কর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন, অভাব-অভিযোগ শুনতেন। সকলের প্রিয় ছিলেন। তিনি স্ত্রী ও এক পুত্র এবং বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু রেখে গেছেন।

বাড়ছে না সাক্ষরতার হার

(১ পাতার পর)

জানিয়েছেন, বৈঠকে আসার জন্য অম্বিকা সোনী এবং কৃষ্ণা তীরথকে আগেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মানব সম্পদ উন্নয়ণ দপ্তরের মন্ত্রী কপিল সিবালের বক্তব্য হল, রাষ্ট্রীয় সাক্ষরতা মিশনের অনেকগুলি বিষয় ১৯৮৮ সালে (তখন রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন) চালু হয়েছিল। নানান ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে বিষয়টা বোধগম্য হয়নি। তাছাড়া কেন্দ্র ও জেলা সরাসরি সম্পর্কিত থাকার ফলে রাজ্য সরকারগুলো এ নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি। আর জেলা কালেক্টরদের চাপ এত বেশি থাকে যে তারা এদিকে সময় দিতে পারেননি।

বলা বাহুল্য, স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে গত ৬২ বছরে সাক্ষরতার হার মাত্র ৬৪ শতাংশ, তাও আবার সরকারি হিসেবে খাতায় কলমে। প্রকৃত অবস্থাটা সরেজমিনে খতিয়ে দেখলে আরও কম হওয়াই স্বাভাবিক। সবদিক মেনে নিলে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হলেও সার্বিক সাক্ষরতার অগ্রগতি বার্ষিক এক শতাংশেই দাঁড়ায়। এই সময়সীমার মধ্যে এন ডি এ জোট ছয় বছর এবং জনতা পার্টি দু'দফায় প্রায় সাড়ে চারবছর কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন ছিল। অর্থাৎ কেন্দ্রে ৫২ বছর সরকার চালিয়েছে কংগ্রেস এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ।

নেতা, মন্ত্রীদের ছেলে-মেয়েরা আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ডে শিক্ষার সুযোগ পেলেও গরীবগুর্বো ভারতবাসীদের কাছে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাও অধরা থেকে গেছে। এর মধ্যে এন ডি এ জমানায় 'সর্ব শিক্ষা অভিযান' প্রকল্প কার্যকরী (এখনও চালু) না হলে বাৎসরিক সাক্ষরতা অর্জনের হারটা যে এক শতাংশেরও নীচে নামত — একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন।

বাড়ছে হিন্দু ভাবধারা

(১ পাতার পর)

বলে মনে করেন। সমীক্ষায় মাত্র ২৪ শতাংশ মার্কিনী বলেছেন, তাঁরা বাইবেলের 'পুনরুত্থান' তত্ত্বে বিশ্বাস করেন। ঠিক এই কারণেই এখন এক-তৃতীয়াংশ মার্কিন খৃস্টান নাগরিক মৃতদের কবরস্থ না করে দাহ করছেন। এই তথ্য দিয়েছে ক্রিমেসন অ্যাসোসিয়েশন অব নর্থ আমেরিকা। লিজা মিলার লিখেছেন, গোটা আমেরিকায় এখন এমন একটিও স্থান পাওয়া যাবে না, যেখানে হিন্দু মন্দির নেই। এইসব হিন্দু মন্দিরের পৃষ্ঠপোষক মার্কিনীরাই।

রাজ্য রাজনীতি

রাজ্য সি পি এমের অবলুপ্তি কি ঠেকানো যাবে?

নিশাকর সোম

গত কয়েকদিন একটি সংবাদ নিয়ে কিছু দৈনিকে সিপিএম বিরোধী প্রচারকে এক নতুন খাপে ভরার জন্য প্রচার করা হয়েছে যে, বিজেপি-র নিকট অসীম দাশগুপ্তর দরবার। কেউ কেউ আরও একটু এগিয়ে গিয়ে লিখেছেন, সিপিএম বিজেপি নতুন সমীকরণ। আসলে এরা সকলেই ভয় পেয়ে গেছে। তাই ডিলিরিয়াম। আদর্শগতভাবে বিজেপি-ই প্রকৃত সিপিএম-বিরোধী।

আর একটি কথার উল্লেখ করতে হচ্ছে, দুঃখের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ আনছি। প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তীর পারিবারিক স্মরণ সভায় অতিথি অভ্যাগতদের ফিস ফ্রাই, সিঙ্গাড়া, লাড্ডু ও রসগোল্লা খাওয়ানো। সভার সভাপতি সুভাষবাবুর শ্যালক নন্দ ভট্টাচার্য বলেছেন, “এ বাড়িতে এসে কেউ না খেয়ে যেতেন না, তাই এই খাওয়ার ব্যবস্থা।” এই ভোজ না দিয়ে দরিদ্র আইলা-ক্ষতিগ্রস্তদের যদি অগ্রিম শীতবস্ত্র অথবা পুজো উপলক্ষে বস্ত্র পোশাকাদি দেওয়া হতো, বোধকরি সেটাই উত্তম ব্যবস্থা হত।

যা'হোক, এখন অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সুভাষ অনুগামীদের বোধ হয় নন্দবাবুই পরিচালনা করবেন। মনিমা অর্থাৎ রমলা চক্রবর্তী কি থাকছেন না? এই সভায় যে শিল্পীগণ এসেছিলেন তাঁরা ব্যক্তি সুভাষকে সম্মান জানিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রণব মুখার্জির নির্বাচনেও কাজ করেছিলেন। এই সভায় জ্যোতিবাবু শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন তাতে তিনি সুভাষ চক্রবর্তীকে “অনুগত সৈনিক” বলে অভিহিত করেছেন। হ্যাঁ ঠিকই, সুভাষ চক্রবর্তী ক্যাপ্টেন জ্যোতি বসুরই “অনুগত” ছিলেন — তাই নয় কি?

দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খাদ্যমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সভা ডাকা হয়। এই সভার সংবাদ মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে যথাসময়ে কেন্দ্র জানিয়েছিল। কেন্দ্রের ডাকা এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় মুখ্যমন্ত্রী নিজে যাননি — কারণ, অসুস্থতা। কিন্তু তিনি অন্য কোনও মন্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েও পাঠাননি। উপরন্তু কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রীদের এই সভার খবরও দেননি। কৃষি ও খাদ্য দপ্তর ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে। ফরওয়ার্ড ব্লক এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছে। আদতে বুদ্ধবাবু কেন্দ্রীয় সরকারের মুখোমুখি হতে চাইছেন না। যে মুখ্যমন্ত্রীর এইরকম কাজে অবহেলা এবং নিস্পৃহভাব, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী রেখে লাভ কি? বিশেষ করে মাওবাদী ও জনগণের কমিটি তাদের কাজকর্ম তো জোরের সঙ্গে চালিয়ে যাচ্ছে।

বস্তুত লালগড় তথা সংলগ্ন অঞ্চলে সরকারি প্রশাসন কিছুই নেই। এই অঞ্চলে সমান্তরাল পাল্টা “সরকার” কাজ চালাচ্ছে। ছত্রধর মাহাতো সাইকেল করে গ্রামের পর গ্রাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। নকশাল নেতা কিষেণজি লালগড়ে রয়েছেন, তিনি শীঘ্রই মঙ্গলকোটে যাবেন বলে ঘোষণা করেছেন। কিষেণজি বাজারী পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিচ্ছেন অথচ পুলিশ, যৌথবাহিনী ছত্রধর ও কিষেণজিকে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। বুদ্ধবাবুর প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। কেন্দ্রের কাছে মুখ দেখাবার সাহস নেই বুদ্ধবাবুদের।

এদিকে ১০০ দিনের কাজের ব্যাপারে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বুদ্ধবাবু বিমানবাবু বামফ্রন্ট-এ নিন্দিত এবং কোণঠাসা। লজ্জার মাথা খেয়ে এখনও এই দু'জন ক্ষমতা আঁকড়ে বসে আছেন!

বিমানবাবু সম্প্রতি সিপিএম-এর কলকাতা জেলা কমিটির নেতৃস্থানীয় কর্মীদের এক সভায় প্রমোটার সংস্রবে থাকা পার্টি সদস্যদের বহিষ্কারের কথা বলেছেন। আর যখন প্রয়াত শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী তথা মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী “প্রমোটার রাজ” বলেছিলেন, তখন জ্যোতি বসু তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে বলেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে বলতে চাই জ্যোতি বসু যখন সোনার চামচ মুখে দিয়ে বিলিতি কনভেন্ট-এ ছাত্র ছিলেন তখন বিনয় চৌধুরী বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে স্বাধীনতার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন।

সংবাদপত্রে দেখা গেল ফরওয়ার্ড ব্লক মন্ত্রীদের কেন্দ্রের সরকার-এর ডাকা সভার খবর না দেওয়ার দরুণ ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতা অশোক ঘোষ উষ্মা প্রকাশ করেছেন। আশ্চর্য, এত অবজ্ঞা অবহেলা সহ্য করে মন্ত্রিসভায় ফরওয়ার্ড ব্লকের থাকাটা তো ক্ষমতার ক্ষীর লাভের আশা ছাড়া আর কিছুই নয়। মন্ত্রিসভায় থাকার দরুণই তো কোটি টাকার হেমন্ত ভবন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন রাজ্য সিপিআই-এর ভুপেশ ভবন। আর সিপিএম-এর তো ইতিমধ্যে ব্রাঞ্চ পর্যন্ত বাড়ি তৈরীই, তবে তা শেষ নয়। অনুজ পান্ডের মতো বহু নেতা গাড়ি-বাড়ি-স্বজনদের চাকরির পাকা ব্যবস্থা করে অস্তাচলে যাবার পর্যায়ে এসেছে। রাজ্যের কৃষক শ্রমিক এবং মার্কেটিং-এর কাজে লিপ্ত হাজার-হাজার বেকার যুবকদের জীবনটাই শেষ হওয়ার পথে। এদের কথা কাগজে বিবৃতির মারফৎ দিয়েই কর্তব্য খালাস। ধন্য বামপন্থা, ধন্য রাজনীতি।

নব-নিযুক্ত পরিবহন মন্ত্রী রণজিৎ কুণ্ডু — তিনি নাকি সুভাষ অনুগামী (?)। তিনি যদি সুভাষ চক্রবর্তীর পথে হেঁটে যাত্রীদের স্বার্থ না দেখে বাস-অটো-মালিকদের স্বার্থ দেখেন তবে তিনি নিন্দিতই হবেন। বাসের কনডাক্টার এবং অটোচালকদের দৌরাত্ম্যে যাত্রীরা যার পর নাই লাঞ্ছিত হন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। চাঁদনী চকে ট্রাম-বাস স্টপে সার সার অটো দাঁড়িয়ে থাকে। যাত্রীভর্তি হলে স্টপে অপেক্ষমান মানুষজনকে ধাক্কা দিয়ে পায়ের উপর দিয়ে অটো চালিয়ে দেয়। এই অটো-চালকদের কিছু বলা যাবে কি? কারণ এঁরা সকলেই মুসলিম। রণজিৎ কুণ্ডু কি সরকারি পরিবহনে লক্ষ লক্ষ টাকার ঘাটতি কমাতে পারবেন?

বাসভাড়া সম্পর্কে এক জনের যে কমিশন গঠনের কথা সুভাষবাবু বলেছিলেন, সেটা কি হল? আশা করি রণজিৎবাবু প্রকাশ্যে ঘোষণা করুন। রণজিৎবাবু, হাইকোর্টের রায়ের পর বৎসরাধিক কাল অপেক্ষা করে পুরানো বাসের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করা হল কেন?

রণজিৎবাবু, জনগণ এই দপ্তরের স্বচ্ছতা চান। ক্রীড়া-যুবকল্যাণ দপ্তর যাঁর হাতে গেছে তিনি বস্তুত আরও একজন সুভাষ চক্রবর্তী। তিনি কি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের দুর্নীতির তদন্ত করাবেন?

রণজিৎবাবু বলেছেন, তিনি কন্টকাকীর্ণ আসনে বসছেন। ঠিক কথা। তাঁর দুই পূর্বসূরী এই কাঁটাগুলি পুঁতে গেছেন।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকেই সিপিএম-এর পলিটব্যুরোর সভায় কেরলে পার্টির অবলুপ্তি এবং পশ্চিমবঙ্গের অবলুপ্তির দিকেই যাওয়া নিয়ে আলোচনা হবে। ইতিমধ্যেই বিনয় কোঙার নেতৃত্বের পদ ছাড়তে চান। নিরুপম সেনও মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করতে চান। শোনা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের পার্টির রাজ্য সম্পাদকগুলীর পরিবর্তন হবে। রণজিৎ কুণ্ডুকে রাজ্য কমিটিতে কো-অপ্ট করার কথাও হচ্ছে।

কিন্তু বুদ্ধ-বিমান-শ্যামল ক্ষমতার মধু ছাড়বেন না!

“ কেন্দ্রের ডাকা এই গুরুত্বপূর্ণ সভায় মুখ্যমন্ত্রী নিজে যাননি — কারণ, অসুস্থতা। কিন্তু তিনি অন্য কোনও মন্ত্রীকে দায়িত্ব দিয়েও পাঠাননি। উপরন্তু কৃষি ও খাদ্যমন্ত্রীদের এই সভার খবরও দেননি। কৃষি ও খাদ্য দপ্তর ফরওয়ার্ড ব্লকের হাতে। ফরওয়ার্ড ব্লক এই ঘটনার তীব্র সমালোচনা করেছে। আদতে বুদ্ধবাবু কেন্দ্রীয় সরকারের মুখোমুখি হতে চাইছেন না। যে মুখ্যমন্ত্রীর এইরকম কাজে অবহেলা এবং নিস্পৃহভাব, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী রেখে লাভ কি? ”

অন্য রকম

ঘুড়ির জন্য

নিজস্ব প্রতিনিধি।। বিজ্ঞানী বিজ্ঞানে মেতে থাকবেন — এটাই স্বাভাবিক রীতি হওয়া উচিত ছিল তাঁর জীবনে। কিন্তু তিনি তা নন। মস্ত বড় বিজ্ঞানী হয়েও, ঘুড়ি

ঘুড়ি হাতে দাদা ও সাইগল।

তৈরিতে ডুবে থাকাটা তাঁর কাছে বেশি প্রিয়। দেবিন্দর সিং-এর কাছে ঘুড়ি তৈরিই তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। তাঁর এই বিচিত্র শখে তিনি শুধু একা নন। সঙ্গে আছেন মনমোহন দাদাও। দু-জনেই চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা। বয়স দু'কুড়ি দশের ঘরে। একজন ফরেন্সিক বিজ্ঞানী। অন্যজন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কর্মরত। কর্মজীবনে দেবিন্দর ও মনমোহন দু-জনেই যথেষ্ট সফল। শুধু অর্থ নয়, মান-সম্মানও কম পাননি জীবনে তাঁরা। এই বিচিত্র শখকে তাঁরা 'বুড়ো বয়সে ভিমরতি' হিসাবে দেখতে রাজি নন। উল্টে নিজের শখে ডুবে থাকাটাই তাঁদের কাছে গর্বের বলে মনে হয়। খুব ছোটোবেলাতেই তাঁরা ভেবেছিলেন বড় হয়ে ঘুড়ির ওপর কিছু একটা করতে হবে। তাঁদের সেই স্বপ্ন ক্রমশ বাড়তে থেকেছে মনের গোপন ঘরে। আজ তা সফল। শুধু ভুরি ভুরি ঘুড়ি তৈরি, আর বিক্রি এই লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা এই লাইনে আসেননি। দেবিন্দর ছোটো ঘুড়ি তৈরিতে মাহির। ইতিমধ্যেই সব থেকে ছোটো সাইজের ঘুড়ি তৈরি করে 'লিমকা বুক অফ রেকর্ডস'-এ নাম তুলেছেন তিনি। শুধু তাই নয়, নিজের সৃষ্টি করা ঘুড়ির গায়ে চলমান ঘটনার চিত্রও তুলে ধরেন তিনি। ২৬।১১ থেকে কোনও বিশেষ দিনের ঘটনা, ছবি আকারে ঘুড়িতে প্রকাশ করেন দেবিন্দর যাতে মনে পড়ে যায় অতীত। আর তা থেকে শিক্ষা নিতেই দেবিন্দরদের এই নতুন সংযোজন।

দেবিন্দর, মনমোহনের ঘুড়ির কথা চণ্ডীগড়ের সকলেই ভালোভাবে জানেন সেই সঙ্গে তাঁদের সমাজ সংস্কারের রূপটাও। তাই বাচ্চাদের প্রতিভা বিকাশের কোনও অনুষ্ঠান হলেই ডাক পড়ে তাঁদের। বিচারপতির আসনে বসেন দেবিন্দরদ্বয়। একদিকে বিজ্ঞানী, অন্যদিকে ঘুড়ি নির্মাতা দুই পৃথক মেরুর কাজ হলেও, দেবিন্দরের সম্মান দুই মেরুতেই। দুই ক্ষেত্রেই তিনি সফল। সমাজের কাছে রাষ্ট্রের বড় ম্যাসেজ তুলে ধরেন তিনি। বাচ্চারাও ঘুড়ি ওড়ানোর সময় জানতে পেরে যায় বড় বড় সব কর্মকান্ডের কথা। মকর সংক্রান্তি, বসন্ত পঞ্চমীর দিন আকাশে দেবিন্দরদের তৈরি ঘুড়িও ওড়ে। তবে তা ভো কাট্টা বলে না বলে অন্য কথা। সমাজের, রাষ্ট্রের।

অসম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড জঙ্গিতে ছয়লাপ

ব্যর্থতা কবুল করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। সম্প্রতি দিল্লীতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিষয়ক সম্মেলনে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম্ স্বীকার করে নিয়েছেন যে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ দমনে সরকার তেমন সাফল্য পায়নি। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি প্রদেশের মধ্যে সব থেকে বেশি সন্ত্রাসবাদ জর্জরিত তিনটি প্রদেশ হলো — অসম, নাগাল্যাণ্ড এবং অপেক্ষাকৃত ছোট রাজ্য মণিপুর।

ধৃত মণিপুরী জঙ্গি।

অসমে দুটি শক্তিশালী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন হল — ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ্ অসম (উলফা) এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ্ বোড়োল্যাণ্ড (এন ডি এফ বি)। এছাড়া আরও অনেক সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী সংগঠন অসম জুড়ে সক্রিয়। উলফা গঠিত হয়েছিল ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে। উলফা প্রায় তিনদশক ধরে সক্রিয়। উলফার একটা ভগ্নাংশ আত্মসমর্পণ করে জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে ফিরে গেলেও উলফার কোমর ভাঙ্গতে পারেনি নিরাপত্তা বাহিনী। উলফা'র লক্ষ্য স্বাধীন অসম আর এন ডি এফ বি-র লক্ষ্য স্বাধীন বোড়োল্যান্ড (অসমের বোড়ো জনজাতিদের জন্য)। এছাড়াও অসমে আরও আটটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন দারুণ সক্রিয়। যেমন, কারবি লাংরি লিবারেশন অর্গানাইজেশন, অল আদিবাসী ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি, ডিমা হালাম দাওগা (জুয়েল গার্লোসা — ব্ল্যাক উইডো নামে বেশি পরিচিত), ডিমা হালাম দাওগা (নুনিসা), কুকি রেভলিওশনারি আর্মি, মার পীপুলস্ কনভেনশন (ডেমোক্রেটিক), মুসলিম ইউনাইটেড লিবারেশন টাইগার্স অফ্ অসম, পীপুলস্ ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (মুসলিম জিহাদী গোষ্ঠী — অসম এবং মণিপুরে সক্রিয়)। উলফা এবং এন ডি এফ বি-র দুটি গোষ্ঠীর সঙ্গে এসময় ভারত সরকারের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি রয়েছে। বোড়োদের একটি রাজনৈতিক দলও আছে যার নাম বোড়ো পীপুলস্ প্রগ্রেসিভ ফ্রন্ট বা বি পি পি এফ্। বি পি পি এফ কেন্দ্র এবং রাজ্যে কংগ্রেসের জোট সরকারেও সামিল আছে। আরও চারটি গোষ্ঠীর সঙ্গে কেন্দ্রের যুদ্ধ বিরতি চুক্তি রয়েছে। তারা হল — ইউনাইটেড পীপুলস্ ডেমোক্রেটিক সলিডারিটি (অসমের কার্বি আংলং জেলায় সক্রিয়), আদিবাসী কোবরা মিলিট্যান্ট ফোর্স, বিরসা কমাণ্ডো ফোর্স এবং ডিমা হালাম দাওগা বা ডি এইচ ডি।

অসমে সন্ত্রাসবাদীদের হামলার ঘটনা কিন্তু থেমে নেই — ২০০৭-এ ২৪৮টি, ২০০৮-এ ২০৭টি এবং ২০০৯-এ এখনও পর্যন্ত ২২১টি সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটেছে। ২০০৭-এ ১৩২ জন, ২০০৮-এ ৯৩ জন এবং ২০০৯-এর প্রথম পাঁচ মাসে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ৮৩ জন সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছে।

নাগাল্যাণ্ডের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। প্রথম হোতা ছিলেন নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিলের অবিসংবাদিত নেতা এ জেড ফিজো। তিনিই স্বাধীন নাগাল্যাণ্ডের পতাকা তুলে আন্দোলনের বিউগিল বাজান। তারপর থেকে ধারাবাহিক সশস্ত্র নাগা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলে আসছে। তখন থেকেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে বিভিন্ন সংগঠন নাগাল্যাণ্ডে গজিয়ে উঠেছে এবং ভারত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে। তবে এখন মূলত দুটি সংগঠনই সব দৃষ্টিতে সক্রিয় —

(১) ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ্ নাগালিম্ (আইজাক-মুইভা)।

(২) ন্যাশন্যাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ্ নাগালিম্ (খাপলাং)।

নাগাল্যাণ্ডে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ঘটনা ২০০৭-এ ১২৮টি, ২০০৮-এ ১৪৫টি এবং মে ২০০৯ পর্যন্ত ৫৬টি ঘটনা ঘটেছে। ২০০৭-এ নাগরিক মৃত্যুর ঘটনা ২১, ২০০৮-এ সন্ত্রাসবাদীকে হাতে ৩৫ জন এবং মে-২০০৯ পর্যন্ত দু'জন নাগরিক মারা গিয়েছে।

মণিপুর রাজ্য হিসেবে খুব একটা বড় না হলেও মণিপুরে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সংখ্যা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্বাধিক। ওখানে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী রয়েছে। রয়েছেনাগা, কুকি, মণিপুরী, মুসলিম জেহাদি সন্ত্রাসী গোষ্ঠী মণিপুরে জনগোষ্ঠী হিসেবে মূলত তিনটি গোষ্ঠী। এবং দাপুটে জঙ্গিগোষ্ঠীও ওই তিনটি জনগোষ্ঠী থেকেই এসেছে — মৈতেয়ী, নাগা এবং কুকি জনজাতি। মৈতেয়ী জঙ্গিগোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য হল বৃটিশ ভারতের মণিপুরের যে ভৌগোলিক এলাকা তাকে ভারতের কবল থেকে পুনরুদ্ধার করা।

নাগা জঙ্গিরা তাদের বৃহত্তর নাগাল্যাণ্ড অর্থাৎ তথাকথিত নাগালিম্-এর মধ্যে মণিপুর, অসম, অরুণাচল প্রদেশ এবং মায়ানমারের নাগা বসতিযুক্ত এলাকাকে অন্তর্ভুক্ত করা। আর কুকিরা আলাদা কুকিল্যাণ্ডের দাবী আদায়ে সন্ত্রাসে নেমেছে। একই কাজ মায়ানমারের মধ্যেও চালাচ্ছে। মণিপুরের জঙ্গিদের সন্ত্রাসী ঘটনার খতিয়ান — ২০০৭-এ ২৪০টি, ২০০৮-এ ২৬২টি, ২০০৯-এর প্রথম পাঁচ মাসে ২১১টি। ২০০৭-এ নাগরিক হত্যার ঘটনা ঘটেছে ৪৬, ২০০৮-এ জঙ্গিদের হাতে ৭৬ জন এবং ২২০৯-এর মে মাস পর্যন্ত ৪০ জন নাগরিক জঙ্গিদের হাতে নিহত হয়েছে। মণিপুরের বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠন-এর তালিকা কিন্তু বেশ বড় — পীপুলস্ লিবারেশন আর্মি (পি এল এ), ইউনাইটেড ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট (ইউ এন এল এফ), রিভল্যুশনারি পীপুলস্ ফ্রন্ট (আর পি এফ), পীপুলস্ রিভল্যুশনারি পার্টি অফ্ কাংলেইপাক (পি আর ই পি এ কে), মণিপুর লিবারেশন ফ্রন্ট আর্মি (এম এল এফ এ), কাংলেই ইয়াউন খানা লুপ (কে ওয়াই কে এল), পীপুলস্ ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (পি ইউ এল এফ), কাংলেইপাক কম্যুনিস্ট পার্টি (কে সি পি), ন্যাশন্যাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ্ নাগাল্যাণ্ড (এন এস সি এন-কে), ন্যাশন্যাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যাণ্ড (এন এস সি এন — আইজাক-মুইভা), নাগালিম্ গার্ড (এন এল জি), কুকি ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট (কে এল এফ), কুকি ন্যাশন্যাল আর্মি (কে এন এ), কুকি ডিফেন্ট ফোর্স (কে ডি এফ), কুকি ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট (কে ডি এম), কুকি ন্যাশন্যাল অর্গানাইজেশন (কে এন ও), কুকি সিকিউরিটি ফোর্স (কে এস এফ), চীন কুকি রেভল্যুশনারি ফ্রন্ট (সি কে আর এফ), কোম রেম পীপুলস্ কনভেনশন (কে আর পি সি) , জোমি রেভল্যুশনারি ভলান্টিয়ার (জেড আর ভি), জোমি রেভল্যুশনারি আর্মি (জেড আর এ), জোমি রি-ইউনিফিকেশন অর্গানাইজেশন (জেড আর ও) এবং মার পীপুলস্ কনভেনশন (এইচ পি সি) প্রভৃতি।

ক্যাডারদের সঙ্গে আই-এম নেতৃবৃন্দ।

বি ডি আর বিদ্রোহের প্রতিক্রিয়া

বি ডি আর-এর নাম বদল করল বাংলাদেশ

তৌহিদুর রহমান ।। নাম, পোশাক পরিবর্তন, নিয়োগ প্রক্রিয়াসহ বিভিন্ন সুপরিশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে গত ১৯ আগস্ট বিডিআর পুনর্গঠন বিষয়ক রিপোর্ট পেশ করেছেন বিডিআরের ডি জি মেজর জেনারেল মইনুল ইসলাম। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, পিলখানা হত্যাকাণ্ডের পর বিডিআরের পুনর্গঠনে গঠিত কমিটি বিডিআরের নাম পরিবর্তন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) রাখার প্রস্তাব দিয়েছে। বাহিনীর লোগো, গাড়ির রঙ আগের মতোই নীল রাখার প্রস্তাব করা হয়েছে। মনোগ্রামে থাকবে সীমান্ত পিলার, তার দুই পাশে রাইফেল, ধান ও গমের শীষে আবৃত, উপরে শাপলা ফুল। প্রস্তাবে দুই ধরনের পোশাকের কথা বলা হয়েছে। একটি কালো, ধূসর বা খয়েরি সামরিক পোশাক, অপরটি একরঙা কালচে খয়েরি শার্ট ও ধূসর প্যান্ট। প্রস্তাবিত সুপারিশে বর্তমান কাঠামো বদলে সারা দেশকে ৪টি অঞ্চলে ভাগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঢাকাসহ অন্য ব্যাটালিয়নে সংরক্ষিত গোলাবারুদ ব্যাটালিয়নে না রেখে কাছের সেনাবাহিনীর অস্ত্রাগারে রাখার সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটি বি ডি আর-এর জন্য তিন স্তরবিশিষ্ট গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক তৈরির প্রস্তাব করছে। সেনাবাহিনীর আদলে র‍্যাংক অনুযায়ী চাকরির বয়স নির্ধারণের পরামর্শ দিয়েছে কমিটি। নিয়োগের বয়স ১৭ থেকে বাড়িয়ে ১৯ বছর করার প্রস্তাব করা হয়েছে। জনবল বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে রিপোর্টে। আঞ্চলিক প্রধান হবেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তা। তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে সেক্টর ও ব্যাটালিয়ন।

বাংলাদেশে বিদ্রোহের সময় বি ডি আর। (ফাইল চিত্র)

সবক্ষেত্রে কোম্পানীর কমান্ডার মেজর বা ক্যাপ্টেন পদের কর্মকর্তা হবেন। বর্তমানে কোম্পানীর কমান্ডার পদে কর্মকর্তা নেই। এসব ব্যাটালিয়নে দাঙ্গা দমনের সরঞ্জাম রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কমিটি বিডিআরের জন্য তিন স্তরবিশিষ্ট গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক তৈরির প্রস্তাব করেছে। প্রথম স্তরে এনএসআই ও ডিজিএফআইতে বিডিআরের জন্য বিশেষ ডেস্ক থাকবে। ডেস্কে বিডিআর-এর সদস্যও থাকবে। দ্বিতীয় স্তরে থাকবে কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স। সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে।

এদিকে আগামী অক্টোবরে চার্জশিট দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সিআইডি। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এডিশনাল এসপি আবদুল কাহার জানিয়েছেন, মামলার তদন্ত এখন শেষ পর্যায়ে।

(সৌজন্যে দৈনিক ইত্তেফাক, ২০.৮.০৯)

জাতপাতের দ্বন্দ্বে মৃত্যু পরোয়ানার চেনা ছবি উত্তরপ্রদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। মায়াবতীর রাজত্বকালে জাত-পাত নিয়ে নতুন করে সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ। কংগ্রেস, বহুজন সমাজ পার্টি বা মুলায়মের সমাজবাদী পার্টি প্রত্যেকেই ভোটব্যাঙ্ক রক্ষার তাগিদে রাজ্যের হিন্দুদের মধ্যে স্পষ্টতই টেনে দিয়েছে একটি বিভাজন রেখা। গত কয়েক বছরে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশের কয়েকটি জেলায় জাতপাতের সমস্যা নিয়ে বহু রক্ত ঝরেছে। স্রেফ, সমাজে কারা উঁচু আর কারা নীচু -- এই প্রশ্নের সমাধান করার অজুহাতেই নিহত হয়েছেন বহু নির্বিরোধী মানুষ।

এই ধরনের ঘটনার সবচয়ে বেশি খবর মিলেছে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের মজফ্‌ফর নগরে। ২০০৭-এর মাঝামাঝি সময়ে দিল্লী ভিত্তিক ভারতীয় জনসংখ্যার পরিসংখ্যানগত সার্ভের প্রতিবেদন অনুযায়ী, তখনও পর্যন্ত সারা রাজ্যে জাত-পাত নিয়ে মোট মৃত্যুর ঘটনার প্রায় পঁচিশ শতাংশই সংঘটিত হয়েছে ওই জেলাটিতে। কমপক্ষে অন্তত শ-দেড়েক লোক নিহত হয়েছিলেন। ওই হারে না হলেও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের অন্য কয়েকটি জেলা যেমন মীরাট, সাহারানপুর, বিজনৌর এবং আগ্রাতেও জাত-পাতের দ্বন্দ্ব নিয়ে বহু রক্ত ঝরেছে। শুধু পশ্চিম উত্তরপ্রদেশেই নয়, মধ্য উত্তরপ্রদেশের উন্নাও এবং এটাওয়া জেলাতেও ওই ধরনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে পূর্বের বালিয়া জেলাতে এনিয়ে কয়েকটি নৃশংস হত্যার ঘটনাও সংবাদমাধ্যমের সৌজন্যে প্রকাশ্যে এসেছে। এই ব্যাপারে স্পষ্টতই তাদের হতাশা স্বীকার করে নিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিরা। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তর সূত্রের খবর, জাত-পাতের দ্বন্দ্বের কারণে মৃত্যুর ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তালিকাই এখনও অবধি করে উঠতে পারেননি তারা।

জাত-পাতের দ্বন্দ্ব নিয়ে মৃত্যুর ঘটনাগুলিকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, শুধুমাত্র তথাকথিত 'পারিবারিক সম্মান' রক্ষার তাগিদে পরিবারের লোকেরাই সাধারণ পরিবারের অন্তর্গত যুবক-যুবতীদের খুন করে থাকেন। মূলত প্রেমজনিত ক্ষেত্রেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। আর দ্বিতীয়ত, পঞ্চায়েত এই জাতিগত ব্যাপারে নাক গলালে এনিয়ে রক্তপাতের সমূহ সম্ভাবনা দেখা যায়। বিশেষত, উচ্চবর্ণের পঞ্চায়েতের তার জাতের সম্মান রক্ষার্থে তথাকথিত নীচু জাতের লোকেদের আকছার মৃত্যু-দন্ডাদেশ দিচ্ছে এমন দৃশ্য বিরল নয় উত্তরপ্রদেশে। গত দু'জনের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। সবচেয়ে মজার কথা, ওদের মৃত্যুর কোনও প্রত্যক্ষদর্শীই পুলিশ যোগাড় করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত ববিতার কথামতো আফসানার দুই ভাই জাভেদ খান এবং রশিদ খানকে গ্রেপ্তার করে। সেই সঙ্গে ববিতার করা এফ আই আর-এর ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় দুই খুড়তুতো ভাই ওয়াসিম খান ও সুয়াহিব

জাতপাতের দাঙ্গায় নিহত মানুষ।

বছরের নভেম্বর এটাওয়া জেলার পিলাকতারা গ্রামে এভাবেই তিন জনের মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। পুলিশ রেকর্ড বলছে, একটি ব্যক্তি তার বোনকে প্রথমে হত্যা করে স্রেফ এই অজুহাতে যে, সে তার চেয়ে তথাকথিত নীচু জাতের একজনের সঙ্গে প্রেম করছে। পরে একইভাবে ওই লোকটি তার ভাইকেও হত্যা করে। ২০০৭-এ মহেশ সিং ও গুড়িয়া — এই দুই যুবক-যুবতীর অসবর্ণ বিবাহকে কেন্দ্র করে দু'জনকেই ফাঁসিতে ঝোলান সমাজপতিরা। এর আগে ২০০৪-এ মহেশ এবং জানকা-এই দু'জনের ক্ষেত্রেও একই ধরনের শাস্তির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল এবং কারণটা ছিল একই।

জাত-পাতের দ্বন্দ্ব নিয়ে এই বছর রাখী বন্ধনের দিন একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে ওখানকার মীরাট জেলার কিনানগর গ্রামে। গত ৫ আগস্ট ওই গ্রামের মেয়ে ববিতা তার ভাই মনোজকে রাখী পরাবার জন্য তার ঘরে গিয়েছিল। তখন মনোজ বলেছিল তার প্রেমিকা। আফসানা তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে। এরপরে গত ১০ আগস্ট ওই খানকে। তদন্ত থেকে এটাই উঠে আসে, মনোজ একে হিন্দু তায় দলিত। এর সঙ্গেই কিনা প্রেম করছে আফসানা! এতটা অপমান বোধহয় সইতে পারেননি আফসানার বাড়ির লোকজন। তাই তাদের ক্রোধের শিকার শুধু মনোজই হননি, নীচু জাতকে ভালবাসার খেসারত দিতে হয়েছে আফসানাকেও।

এই সবকিছু দেখেও কিন্তু নীরব রাজনৈতিক দলগুলি। 'তারা যখন যেমন, তখন তেমন' — এই নীতিতে চলেছে। উচ্চবর্ণের কাছে তথাকথিত নিম্নবর্গের নিন্দে এবং নিম্নবর্গের কাছে তথাকথিত উচ্চবর্ণের নামে নিন্দেমন্দ করে আখেরে বারোটা বাজাচ্ছে হিন্দু সমাজেরই। প্রয়োজন তাই শিক্ষার। শুধু কেতাবী শিক্ষা নয়, তাদের কাছে পৌঁছনো দরকার মূল্যবোধের শিক্ষারও। আর এই কাজে প্রবল অনিচ্ছুক রাজনৈতিক পার্টিগুলি। কেননা অমন কাজ করলে একদিকে পেট্রো-ডলার, অন্যদিকে ভোটব্যাঙ্ক দু'য়েতেই ধস নামবে যে!

ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন রাজ্যপাল সিবতে রাজিকে নিয়ে সংকটে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। রীতিমতো বিপাকে কংগ্রেস। অসমের সদ্য নিযুক্ত রাজ্যপাল সৈয়দ সিবতে রাজিকে ঘিরে সঙ্কটে পড়েছে দিল্লী হাইকমান্ডও। অবস্থার সামাল দিতে তড়িঘড়ি রাজিকে পদত্যাগের পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু পরিস্থিতি এখনও অনুকূলে নেই কংগ্রেস শিবিরের। সিবতে রাজি ঝাড়খন্ডের রাজ্যপাল থাকাকালীন তাঁর পারিষদ অবিনাশ কুমারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। গোয়েন্দা দপ্তর তদন্তে নেমে তার যথাযথ প্রমাণও হাতে পায়। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর (আই বি) অধিকর্তারা অবিনাশ কুমারের বাড়িতে তল্লাশি চালালে, 'পর্দা ফাঁস' হয়ে যায় রাজিগোষ্ঠীর। অবিনাশ কুমার রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় রাঁচিতে 'ও এস ডি' অফিসার হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। এই অবিনাশ কুমারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে রাজির তৎকালীন আপ্ত সহায়ক রাজেশ ঠাকুরের।

রাঁচির এক প্রাক্তন বিধায়ক প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। সেই সঙ্গে সিবিআই তদন্তের দাবী করেন তিনি। বিজেপি নেতৃত্বও সক্রিয় হয়ে ওঠেন রাজির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের সিবিআই তদন্তের জন্য। সেই মতো সিবিআই তদন্তে নামলে, ঝুলি থেকে বেড়াল বের হয়ে যায়। ১৩ জুলাই রাঁচি কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব রাজিকে সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানায়। যাতে 'সচ কা সামনা' না হয়। এদিকে বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনায় আরও সক্রিয় হয়ে উঠলে, কংগ্রেস হাইকমাণ্ড দ্রুত রাজিকে রাঁচি থেকে সরিয়ে নেন। অসমের প্রয়াত রাজ্যপাল শিবচরণ মাথুরের জায়গায় ২৭ জুলাই সৈয়দ সিবতে রাজিকে স্থলাভিষিক্ত করা হয়। কংগ্রেসের দিল্লী ও রাঁচির শিবিরের ধারণা ছিল এতেই থেমে যাবে সব বিতর্ক। কিন্তু পরিস্থিতি কংগ্রেসের প্রতিকূলে যেতে থাকে। এসময় প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং রাজিকে গত ১১ আগস্টের এক ঘরোয়া বৈঠকে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে অবসর নিতে বলেন। দিল্লী সূত্রে এই খবর জানা গেছে। কিন্তু সিবতে রাজি তা না করে, ইউপিএ সুপ্রীমো সোনিয়া গান্ধীর শরণাপন্ন হন। আর এতেই এখনও পর্যন্ত তিনি খুশ মেজাজে অসমের রাজ্যপালের পদে বহাল রয়েছেন।

২০০৫ সালে বিজেপি একক বৃহত্তম দল হওয়া সত্ত্বেও, তিনি বিজেপিকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ডাকেননি। অর্জুন মুন্ডার পরিবর্তে, নির্দল প্রার্থী মধু কোড়াকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের ডাক দেন। সাধারণত একক বৃহত্তম দলকেই রাজ্যপাল সংখ্যাগরিষ্ঠতা আদায়ের ডেকে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁর এই ভূমিকা রাজ্য-রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলে।

সিবতে রাজি

বিজেপি শিবিরের মতে, মধু কোড়ার পরিবর্তে অর্জুন মুন্ডাকে ডাকলে ঝাড়খন্ডের রাজ্য-রাজনীতিতে এই অবস্থা হতো না। সৈয়দ সিবতে রাজী বরাবরই কংগ্রেসকে সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করেন। সামনেই ঝাড়খন্ডবিধানসভা নির্বাচন। রাজির একান্তে বিজেপির সাফল্য দলীয় কর্মীদের মধ্যেও নতুন করে উৎসাহ যোগাচ্ছে। বিজেপি ইতিমধ্যেই নির্বাচনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিয়েছে। শত্রুঘ্ন সিন্‌হা ঝাড়খড়ড নির্বাচনে বড় ভূমিকা পালন করবেন বলেও খবর।

অন্যদিকে কংগ্রেস শিবির সেদিক থেকে অনেকটাই ব্যাকফুটে। আশার আলো নেই শিবু সোরেনের শিবির ও মধু কোড়ার মধ্যেও। ঝাড়খন্ডবাসীও চায় স্থায়ী সরকারই ক্ষমতায় বসুক। গত পাঁচ বছরে দু'দুবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয়েছে ঝাড়খন্ডে। সবদিকের সমীকরণই বলছে রাজিকে হাতিয়ার করে, বিজেপির ভালো ফলের সম্ভাবনাই বেশি।

কেন্দ্রের 'সেরা রাজ্য'র সার্টিফিকেট গুজরাটকে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। কয়েকদিন আগে পর্যন্তও গুজরাটের নাম শুনলে নাক সিঁটকাতেন কংগ্রেস নেতৃত্বের একাংশ। সেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভারই অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী আদর্শ রাজ্যের সার্টিফিকেট দিলেন নরেন্দ্র মোদীর গুজরাটকে। সেই সঙ্গে আগামীদিনে গুজরাটকে অনুসরণ করে কেন্দ্রের কিছু প্রকল্প রূপায়ণেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বিবেক দেবরায় গুজরাটকে সেরা রাজ্য বলায়, ফাঁপরে পড়েছিলেন দিল্লীর কর্তারা। সদ্য সমাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে প্রণববাবুর এই প্রশংসা শুধু সোনিয়া গান্ধীই নয়, বামেদেরও বিরোধিতার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে বলে মনে করছেন রাষ্ট্র -বিশেষজ্ঞরা। খোদ কেন্দ্রের হিসাবেই ১০০ দিনের কাজের সাফল্যে নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য পয়লা নম্বরে। সেচ ও জলাশয়ের সংস্কারের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য তুলে ধরেছেন তিনি। গ্রামীণ নিশ্চয়তা প্রকল্পের রূপায়ণে গুজরাটকেই সামনে রেখে এগিয়ে যেতে চাইছে কেন্দ্র। সেইসঙ্গে দেশের খরার মতো সঙ্কট থেকে রক্ষা পেতে মোদীর পথেই হাঁটার কথা বলেছেন প্রণববাবু। গ্রামীণ রোজগার

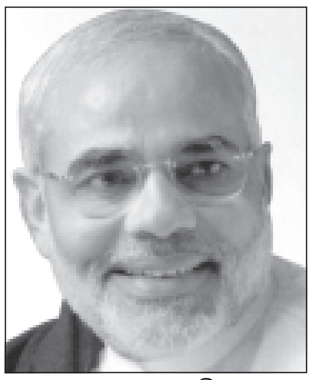

নরেন্দ্র মোদী

নিশ্চয়তা প্রকল্প রূপায়ণের পর কংগ্রেস ও বাম শিবির উভয়েই মাঠে নেমেছিল নিজেদের প্রশংসা আদায়ে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে দেখা গেছে একাজে সাফল্য গুজরাট, মধ্যপ্রদেশের মতো রাজ্যেরই। যেখানে বিজেপি পরিচালিত সরকার। বিজেপি শাসিত রাজ্যের এই সাফল্য থেকে মুখ ফেরাতে পারেননি কংগ্রেস নেতৃত্বও। কংগ্রেসের মুখপাত্র অভিষেক মনু সিংভিও তা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, ইতিবাচক সাফল্য সর্বদাই অনুসরণ যোগ্য। এদিকে একশো দিনের কাজে খরা কবলিত এলাকায় সময়সীমা বাড়ানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার। শুধুমাত্র একশ দিনের নয়, অন্যান্য প্রকল্পেও গুজরাটের সাফল্য কম নয়। ইন্দিরা আবাস প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৯৪,২২৬। গুজরাটের সাফল্য যেখানে ১,০৫,৬৭৩। শতাংশের হিসাবে ১১২ শতাংশ। গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রেও গুজরাটের সাফল্য পুরোপুরি ১০০ ভাগ। লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪,২৩২। তফসিলি পরিবার সহায়তা প্রদানে দেশজুড়ে লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৭৫,২৩৭, গুজরাট যেখানে পূরণ করে ১৪০০০০। গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিতেও গুজরাট এক নম্বরে। সব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গিয়েছে। সেচ ব্যবস্থারও আমূল উন্নয়ন সাধন করেছেন নরেন্দ্র মোদী।

পুজো এলো.......পুজো এলো.......পুজো এলো.......পুজো এলো.......পুজো এলো.......পুজো এলো.......পুজো এলো.......পুজো এলো.......পুজো এলো.......পুজো এলো.......

সেকালের শারদীয়া পত্র-পত্রিকায়

বাংলার দুর্গোৎসব

নবকুমার ভট্টাচার্য

কে যে কবে দশভূজা দুর্গা পুজোর প্রচলন করেছিলেন তা আজ ইতিহাসের বিষয়। বাংলাদেশে শরৎকালে দশভূজা পুজোর আয়োজন বহুবছর ধরে চলে আসছে। আকাশে যখন শরতের সোনালি মেঘ, বাতাসে পাখির কলতাল, শিউলির সৌরভ, মাটিতে পক্কশ্যাম শস্যরাশি তখনই আগমনীর গান ধ্বনিত হয়।

সেকালে দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে ভিখারিরা আগমনী গান গাইত দুয়ারে দুয়ারে। মুখে মুখে মা দুর্গার স্তবস্তুতি শোনাত। পরবর্তীকালে ছাপাখানার যুগে রামপ্রসাদী, আগমনী গানের ছোট ছোট সঙ্কলন বিক্রি হতো। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এলো শারদীয়ার পত্র-পত্রিকা। যদিও সেগুলি একালের পুজো সংখ্যার মতো বিরাট মাপের ছিল না। কিন্তু বিষয়বস্তুতে ছিল অভিনব এবং একালের থেকেও আকর্ষণীয়। তাছাড়া পুজো নিয়ে সেকালের পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে নানা খবর। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোর বিবরণ জানতে হলে ওলটাতে হবে সেকালের নানা সাময়িকীর বিবর্ণ, জীর্ণ পৃষ্ঠাগুলি। এখন যেমন শারদীয় সাহিত্য, তখন ছিল পুজোর বই। খুব ছোট ছোট আকারের। প্রকাশক ছিল বেশির ভাগই বটতলার। তবে মফঃস্বলেও ছাপা হত কিছু কিছু।

বাংলা ১২৯১ সনে বটতলা থেকে 'দুর্গোৎসব লহরী' নামে ছত্রিশ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশিত হয়। এই বইটিতে দেবী দুর্গাকে বন্দনা করা হয়েছে অকাল বোধনের কাহিনী অবলম্বনে। এইরকমই একটি বই ১২৯৯ সনে পুজো উপলক্ষে প্রকাশ করেন একজন স্কুলছাত্র — আরাধন চক্রবর্তী। ১২ পৃষ্ঠার এই বইটির নাম 'আগমনী'। এই বইটিতে দেবীকে বন্দনা করা যেমন হয়েছে তেমন সংসারের দুঃখ দুর্দশার অবসানও চাওয়া হয়েছে দেবীর কাছে। ইংরাজী ১৮৯১ সনে ক্ষেত্রনাথ ঘোষ নামে তৎকালীন জি এ ইনস্টিটিউশনের দ্বিতীয় শ্রেণীর আর এক স্কুল ছাত্র 'সুখের শরৎ দুর্গোৎসব' নামক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। বইটি ছাপা হয়েছিল কলকাতার ১৬০, মসজিদ বাড়ী স্ট্রীট এর এস সি সেনের গ্রেট টাউন প্রেস থেকে। বইটির বিষয়বস্তু দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে শহুরে মানুষের বেলেল্লাপনা। ১৮৮৩ সনে প্রকাশিত হয়েছিল 'দুর্গোৎসব উদ্ভট কাব্য'। লেখক ছিলেন শ্রী ষড়ানন্দ শর্মার ছদ্মনামে ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়। এই বইটিতে দুর্গোৎসব উপলক্ষে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ-দুঃখের কাহিনীই ছিল মুখ্য উপজীব্য। যেমন —

"কোথাও ভাবিছে আহা কত শত জন
পূজার কাপড় হবে পাইলে বেতন।
তাতেও কি হবে হায়! সব সঙ্কুলান
কি হবে ভাবিয়ে কিছু না পান সন্ধান।"
অথবা
'পাঠাতে পূজার তত্ত্ব উন্মত্ত সবাই
বিশেষত যাহাদের নূতন জামাই,
মাসাবধি হ'তে হইতেছে আয়োজন
বিবিধ সামগ্রী কত রকমই বসন,
সুন্দর ইংরাজ কর নির্মিত বিনামা
বিহীন হইলে তত্ত্ব সম্ভ্রম রবে না।
অতএব সাবধান হে শ্বশুর কুল!
দেখো করও নাকো যেন "তত্ত্বে" স্থুলে ভুল।"

১৩০২ সনে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্গোৎসব নিয়ে একটি বই 'পাঁচু ঠাকুর' প্রকাশ করেন। এই বইটির পহেলা পর্ব — নিমন্ত্রণ পত্র রীতিমতো আকর্ষণীয়। মাত্র দু'আনা দামের ঊনিশ পৃষ্ঠার কবিতার বই 'পূজার বাজার' প্রকাশ করেন জালালউদ্দিন আহম্মদ। বইটি ময়মনসিংহ জেলার বাসন্তী যন্ত্রে মুদ্রিত। কবিতার বইটিতে সেকালের কেনাকাটার সুন্দর বর্ণনা আছে। সেকালের আর এক কবির পাগলামী 'পুজোর পাগল'। কবি অখিল চন্দ্র লাহিড়ীর লাল কালিতে চৌত্রিশ পৃষ্ঠার একটি টুকরো বই। বইটির মূল বিষয় বস্তু প্রবাসী কেরাণীকুলের কাতরতা, যা সেকাল একালের জীবন্ত ছবি।

"গত সপ্তাহে গিন্নীর এক পত্রে
লেখা ছিল প্রায় পঞ্চাশটি ছত্রে।
সাজ সরঞ্জাম, এটা ওটা, সেটার
মস্ত একখানা লিস্টি।
যাক্ ওসব কথা ছুটি পেলেই হয়
নইলে যত আশা কিছুই কিছু নয়।"

এই সমস্ত লেখার মধ্যে সেকালের সমাজ চিত্রের একটা পূর্ণরূপ আমরা পাই। হুতোম প্যাঁচার নকশায় তো সেকালের দুর্গাপুজোর প্রতিটি চিত্রের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও অমৃতলাল বসুর 'কৌলিক দুর্গোৎসব' এবং রায় জলধর সেন বাহাদুর-এর 'আনন্দময়ী' সেকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা।

সেকালের পত্র-পত্রিকায় ছড়া ও প্রবন্ধের প্রাধান্য থাকলেও গল্পও প্রকাশিত হতো। ১৩২০ সালে অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর চারটি গল্প নিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ 'পুজোর গল্প' প্রকাশিত হয়। এছাড়া সেকালের পত্র-পত্রিকায় দুর্গাপূজার নানা দিক নিয়ে নানা রচনা প্রকাশিত হয়েছে। ১২৯৯ সনের আশ্বিন সংখ্যায় 'জন্মভূমি' পত্রিকায় 'ঘোষজা মহাশয়ের দুর্গোৎসব' কিম্বা ১২৮৬ সালের ২ কার্তিক সংখ্যার 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় 'নিধিরামবাবুর কি নিষ্ঠা' এক মূল্যবান সংযোজন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের পত্রিকা ছিল 'ভারতী'। এই পত্রিকারও বিশেষ পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হতো। সরলা দেবী সম্পাদিত এই পত্রিকার পুজো সংখ্যায় একবার বিশেষ ভূমিকা লিখেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১২৮২ সালের 'তমোলুক' পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল দুর্গোৎসব উপলক্ষে একটি প্রবন্ধ 'নব দুর্গা মাহাত্ম্য'। শ্রীরামকৃষ্ণ রায় রচিত এই প্রবন্ধটি সেকালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কারণ দুর্গোৎসব উপলক্ষে বাবুদের বেলেল্লাপনাকে কটাক্ষ করা হয়েছিল এই প্রবন্ধে। বলা হয়েছিল — "সর্ব দুঃখ ভবে দেবী আসুপ্রাণ বিনাশিনী, ত্রাহি মাং দেহি মাং শান্তিং কাচপাত্র বিলাসিনী।'

এছাড়াও সেকালের নানা পত্র-পত্রিকায় রয়েছে দুর্গোৎসবের নানা দিক নিয়ে নানা তথ্য, যা একালের পাঠকের কাছে অজ্ঞাত।

সেকালের পুজোর নিমন্ত্রণপত্র

শ্রীশ্রী দুর্গাশরণং শারদীয়া—
যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন মিদং,

সৌর আশ্বিনস্য নবম দিবসাবধি দিন চতুষ্টয় মদীয় ভবনে শ্রীশ্রী মহাপূজা হইবেক। তদুপলক্ষে চতুর্থ দিবসে বুধবাসরে রামকৃষ্ণপুর নিবাসী কতিপয় মহোদয়গণ কর্তৃক 'লক্ষণ শক্তিশেল' গীতাভিনয় অভিনীত হইবে। অতএব মহাশয়েরা সবান্ধবে পটলডাঙ্গাস্থ ভবনে আগমন পূর্ব্বক প্রতিমা দর্শন এবং অভিনয় দর্শনে অভিনেতৃগণের আনন্দবর্দ্ধন করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম। ইতি — সন ১২৮৩ সাল, ৫ আশ্বিন

— শ্রী দ্বারকানাথ বসু মল্লিকস্য।

দুর্গাপুজোয় বেলুড়মঠে এলাহি আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। স্বামী বিবেকানন্দ যখন বেলুড় মঠে দুর্গাপুজো চালু করেন তখন সেই পুজো সম্পর্কে রবি ঠাকুরের গানের একটি কলি খুব প্রযোজ্য ছিল। কলিটি এরকম 'নেই আয়োজন, নেই মম ধন, নেই আভরণ।' সত্যিই বেলুড় মঠ সম্পর্কে সেই সময় নিন্দে-মন্দ তো খুব একটা কম হয়নি। গোঁড়া হিন্দুরা রটিয়ে দিয়েছিল ওই মঠে নাকি হিন্দু আচার-ব্যবহার কিছুই মানা হয় না। এমনকী তৎকালীন হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগানবাড়ি (অধুনা বেলুড় মঠ)-তে আমোদ-ফূর্তি হচ্ছে এই অজুহাতে মঠের ওপর প্রমোদ-করও ধার্য করেছিল। এদের মুখের মতো জবাব দিতেই আমেরিকা ইউরোপ থেকে দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন করে ১৯০১ সালে স্বামী রঘুনন্দনের 'অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব' অনুযায়ী বেলুড়মঠে দুর্গোৎসব আরম্ভ করেন। কিন্তু আরম্ভ করব বললেই হয় না, টাকার সঙ্কুলান থাকা দরকার। শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীকে স্বামীজী নিজেই বলেছেন, 'যদি খরচার সঙ্কুলান হয় তো মহামায়ার পুজো করব।' তবে হাতে বেশি সময় নেই। মাত্র হপ্তা তিনেক আছে। স্বামীজীর নির্দেশে একজন ছুটলেন কুমোরটুলিতে। আরেকজন গেলেন বাগবাজারে শ্রীশ্রীমা সারদার অনুমতি নিতে। বায়না আর করতে হলো না, কুমোরটুলিতে প্রায় রেডিমেড-ই মিললো মৃন্ময়ী মা'র মূর্তি। অনুমতি এসে গেল বাগবাজারের চিন্ময়ী মায়েরও। কষ্টে-সৃষ্টে জোগাড় করা হলো পুজোর খরচাপাতিও। স্বামীজীর আনন্দ আর ধরে না। কারণ ষষ্ঠীতে সশরীরে বেলুড়ের পুজোপ্রাঙ্গণে চলে এসেছেন মা সারদা। সঙ্ঘজননীর নামেই গৃহীত হলো প্রথম পুজোর সঙ্কল্প। ওই বছরই স্বামীজীর অনুরোধে গৌরীমা (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যা) কুমারী পুজোর বন্দোবস্ত করেছিলেন। স্বামীজীর তৈরী করা পুজোর সেই ট্র্যাডিশন আজও সমানে চলছে বেলুড়ে। শুধু 'ফাস্ট অ্যান্ড লাস্ট টাইম' বেলুড়ে প্রথমবারের পুজোয় হওয়া পশুবলি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার পরের বছর থেকেই। আজও মহাষ্টমীর দিন বেলুড়ে কুমারী পুজো দেখতে অগণিত দর্শনার্থী ভিড় করেন। পুজোর চারদিনই খিচুড়ি ভোগ চলে সেখানে। তবে অষ্টমী'র খিচুড়ি অবশ্যই স্পেশাল আইটেম। সাহিত্যিক শঙ্করের ভাষায়, 'জগতের শ্রেষ্ঠ খিচুড়ি'।

তবে এই খিচুড়ি ভোগ রাঁধা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। বিশেষ করে লাখখানেক লোকের ভোগের ব্যবস্থা করতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয় বেলুড়ের 'চীফ সেফ' ঘনশ্যাম পান্ডা এবং তাঁর গোটা পঞ্চাশেক রাঁধুনি ও সহযোগীদের। ২০০৬ সালে বেলুড়ে খিচুড়ি ভোগ গ্রহণ করেন প্রায় পঁচানব্বই হাজার জন। এছাড়াও আয়োজন করা হয়েছিল চার হাজার কেজি বোঁদে ও সতেরো হাজার পিস গজার (কেজিতে চল্লিশ পিস)। এর রেসিপি

সেকালের পুজোর গান

অর্ণব নাগ

আচ্ছা, বাঙালীর 'একস্ট্রা ক্যারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস' সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা ঠিক কি? বাঙালী'র সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে না — 'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?' মানে বলতে চাইছি, সূপকার বাঙালীর পরিচয় তো সর্বজনবিদিত কিন্তু গীতিকার বাঙালী সম্পর্কে আপনি সম্যক অবহিত তো? এই অবধি পড়ে ফেলে মনে মনে এই প্রতিবেদকের সম্পর্কে নিশ্চয়ই ভাবনা হচ্ছে — 'ব্যাটাচ্ছেলের মতলবটা কি? এত ধানাই-পানাই করছে কেন? আবার নতুন কি জ্ঞান দেবে রে?' না, না একেবারেই ভুল ভাবছেন। জ্ঞান দেবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই আমার, বরং গান দেওয়া যেতে পারে। মানে পুজোর মুখে দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে বাঙালীর আগমনী গানের অতীত দিনের নস্ট্যালজিয়াটা কিছুটা উস্কে দিতে চাইছি। বয়স্করা পুলক অনুভব করতেই পারেন;তাঁরা বোধহয় এবার ধরেই নিয়েছেন বাঙালীর গানের স্বর্ণযুগ অর্থাৎ পাঁচের দশক থেকেই প্রতিবেদনটি শুরু করা হবে। কারণ একথা অনস্বীকার্য, স্বর্ণযুগের শিল্পীদের পুজোর সময় অ্যালবাম রিলিজ করা নিয়ে হা-পিত্যেশ করে বসে থাকতেন সেই সময়কার আপামর বাঙালী। কিন্তু মহাশয়! তারও আগে যে একটা সূচনা পর্ব রয়েছে। বলা যেতে পারে বাঙালীর পুজোর গানে সেটা অন্য ধরনের স্বর্ণযুগ। ধরুন না কেন গত শতাব্দীর শুরু থেকেই সেই স্বর্ণযুগের সূচনা। আরে কি মুশকিল! আমার দিকে খামোকা স্টেন-গান তাক করছেন কেন? কি বলছেন — 'ঢপ মারার আর জায়গা পাইনি?' আচ্ছা, আগে সেকালের কথা শুনুন তো। পছন্দ না হলে না হয় সাতদিনের জেল বা তিনদিনের ফাঁসির ব্যবস্থা করবেন।

গত শতাব্দীর একদম গোড়ায় অর্থাৎ ১৯০১ সালেই এসে গিয়েছিল গ্রামাফোন রেকর্ড কোম্পানী লিমিটেড যার নিয়ন্ত্রণ ছিল পুরোমাত্রায় বৃটিশদের হাতে। ইংরেজদের ওয়াটসন হার্ট, এইচ এম ভি প্রভৃতি কোম্পানীগুলি তখন ওই গ্রামাফোন লিমিটেড-এ জাঁকিয়ে বসেছিল। ১৯০৫

সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে উত্তাল হল বঙ্গভূমি। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশমাতৃকার সঙ্গে দুর্গামূর্তির সাদৃশ্য রেখে বহু গান রচনা করলেন। যেমন, 'অয়ি ভুবনমনমোহিনী, মা', 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' ইত্যাদি। ওই গানগুলি স্বতন্ত্রভাবে সেই সময় বিপ্লবীদের যেমন অনুপ্রেরণা জোগায়, তেমনি একই সাথে সাধারণ মানুষের কাছে তুমুল জনপ্রিয়ও হয়ে ওঠে। কিন্তু একথা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়, তৎকালীন গ্রামাফোন রেকর্ড কোম্পানী লিমিটেডের রাশ পুরোপুরি বৃটিশদের হাতে থাকার দরুণ সেই যুগে ওই গানগুলিকে তো রেকর্ড করা হয়ইনি, উপরন্তু পুজোর গানের স্বীকৃতিও দেওয়া হয়নি। যাই হোক, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের রেশ কিছুটা থিতিয়ে যাবার পর গ্রামাফোন রেকর্ড কোম্পানী লিমিটেড ১৯১৪ সালে পুজোয় 'শারদ অর্ঘ্য' নামে পুজোর জন্য ১৭টি গান রেকর্ড করেছিল।

তখনকার দিনে বাঙালীর গান শোনার যন্ত্র হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে 'কলের গান'। তাতে একটা বড় ধরনের চোঙ থাকত, সেটি বসানো থাকত বৃহৎ গোলাকৃতি একটা চাকতি যেটাকে বলা হোত টার্ন টেবিল, তার ওপরে। আর থাকত একটি গোলাকার হাতলওয়ালা চাকতির মতো যন্ত্র যাকে বলা হোত স্পীকার। ছুঁচোলো অনেকটা ঝরণা কলমের নিবের মতো পিন লাগিয়ে লাগিয়ে তাতে গান শুনতে হোত। সেই সময় একটা রেকর্ডের এপিঠে-ওপিঠে দু'টি গান থাকত। হয় দু'দিকেই পুজোর আগমনী গান থাকত অথবা এক পিঠে আগমনী অপর পিঠে বিসর্জনী সঙ্গীত থাকত। ১৯১৪ সালে গ্রামাফোন কোম্পানীর সেই শারদ অর্ঘ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভগিনী অমলা দাশ ইমন কল্যাণ রাগে 'হে মোর দেবতা' এবং সিন্ধু কাফি রাগে 'প্রতিদিন আমি হে জীবন স্বামী' কবিগুরুর এই দু'খানি গান রেকর্ড করেন। তার পরের বছর পুজোর সময় প্রফেসর রাধিকা প্রসাদ গোস্বামীর নটমল্লার রাগে গুরুদেবের 'মোরে বারে বারে ফিরালে' এবং সরলাবাঈ-এর ভৈরবী রাগে 'তুমি কোন কাননের ফুল' — এই দুটি গান প্রকাশিত হয়। তখনকার সময় অমলা দাশই তথাকথিত ভদ্র সমাজের একমাত্র নারী, যিনি সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে অ্যামেচারী সঙ্গীতকে জীবনের এক এবং একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বিশুদ্ধ সুরে ও কথাতেই তিনি গেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সেই গানগুলি। কিন্তু এর পরে বছর পুজোয় অর্থাৎ ১৯১৫ সালে সরলাবাঈ যে রবীন্দ্র -গানটি গেয়েছিলেন তাতে তাঁর বাঈসুলভ গিটকিরি-টিটকিরি যোগ করে আদ্যন্ত রবীন্দ্র- সঙ্গীতটির খোলনলচেই বদলে দিয়েছিলেন তিনি। '১৪ সালের শারদ অর্ঘ্যে তৎকালীন সময়ের এক অনন্য গায়ক কে মল্লিক গেয়েছিলেন দু'টি অসাধারণ পুজোর গান। তাঁর রেকর্ডের একপিঠে ছিল কাফি মিশ্র রাগে আগমনী গান 'গিরি এ কি তব বিবেচনা'। অপরপিঠে ছিল ভৈরবী রাগে বিজয়ার গান 'কি হবে কি হবে, উমা চলে যাবে।'

এবার অনুসন্ধান করা যাক, সে সময় কলের গান কাদের বাড়িতে থাকত। এইচ এম ভি-র ক্যাটালগে কলের গান ও তার মূল্য সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ রয়েছে। সেই বিবরণ অনুযায়ী, দশ ইঞ্চি র ডবল সাইডেড ভায়োলেট লেবেল যুক্ত ধূমল বর্ণের দাম ৩ টাকা বারো আনা এবং নতুন ডবল সাইডেড ব্ল্যাক লেবেল যুক্ত বাংলা গ্রামাফোন রেকর্ডের মূল্য তিন টাকা। বোঝাই যাচ্ছে, অবস্থাপন্ন ও রুচিশীল বাঙালীর ঘরেই তখন বিরাজ করত গানের ওই যন্ত্রটি। ১৯২৫ সালে দিলীপ কুমার রায় কীর্তন অঙ্গে 'বসি সে কুসুম কাননে' এবং মিশ্র সিন্ধু রাগে 'রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে' — এই দু'খানি গান গাইলেন। তখনকার দিনে বিখ্যাত শিল্পীদের কীভাবে পরিচয় দেওয়া হোত, তার একটি মনোমুগ্ধকর নিদর্শন পাওয়া যায় এইচ এম ভি-র ক্যাটালগে। দিলীপ কুমার রায় সম্পর্কে সেখানে লেখা হয়েছিল, 'ইনি স্বর্গীয় মিস্টার ডি এল রায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রী দিলীপ কুমার রায়। ইনি জার্ম্মানী, ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ইউরোপীয় সঙ্গীত শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া ভারতীয় সঙ্গীত রীতিমতো শিক্ষা করিয়াছেন। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চাঙ্গের গায়ক বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।'

কমিক গানে সেই সময় দারুণ নাম-ডাক হয়েছিল নলিনীকান্ত সরকারের। দাদাঠাকুর শরৎ পন্ডিত রচিত দু'খানি গান তিনি গাইলেন '৩৩ সালের পুজোয়। তার মধ্যে একটির শিরোনাম ছিল, 'কলকাতার ভুল' (মরি হায় রে, কোলকাতা কেবল ভুলে ভরা)। অপরটির শিরোনাম 'ভোটামৃত' (আমি ভোটের লাগিয়া ভিখারী সাজিনু ফিরিনু গো দ্বারে দ্বারে)। এইচএমভি-র বিবরণ অনুযায়ী, 'অন্ধ গায়ক' কৃষ্ণচন্দ্র দে ১৯২৭ সালে পুজোর সময় ভৈরবী রাগে 'তোরে কি নামে ডাকি জননী' এবং বৃন্দাবনী সারঙ্গ রাগে, 'আমার জীর্ণ জীবন তরণী'। — এই দুটি গান গেয়েছিলেন। ১৯২৮ সালের পুজোতে স্বয়ং কাজী নজরুলের আবৃত্তি করা 'নারী' কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। পঙ্কজ মল্লিক, কনক দাস প্রমুখ সেই সময় পুজোর গান হিসেবে রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড বার করেছিলেন। তখনকার দিনে এছাড়াও অন্যান্য বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা যাঁরা পুজোর গান গেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত শিল্পীর নাম পাওয়া যায় এইচ এম ভি-র ক্যাটালগে। যেমন — কৃষ্ণভাবিনী, অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়, প্রফেসর চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, এম এন ঘোষ (মন্তাবাবু), আঙুরবালা, ইন্দুবালা, হরেন্দ্রনাথ দত্ত (অ্যামেচার), হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (কমিক), বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় (এইচ এম ভি-র বিবরণ অনুযায়ী, ইনি গহরজানের ছাত্র ও সুকণ্ঠ গায়ক) প্রমুখ। আজকের দিনের এক বিস্মৃতপ্রায় শিল্পী গৌরীকেদার ভট্টাচার্য মোহিনী চৌধুরীর সুরে, 'নাই বো হলো মিলন মোদের' গানটি পুজোর গান হিসেবে রেকর্ড করেন ১৯৪৫ সালের পুজোয়।

যাক্ গে। শুনলেন তো সব। কি ঠিক করলেন? ফাঁসি দেবেন না জেল? কি বললেন স্লো-গান দেবেন? 'তোরা যে যা বলিস ভাই — আমি সেকেলে পুজোর গান শুনতে চাই।'!

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : অসীম ধৈর্য্য ধরে, দিনের পর দিন অপরিসীম নিষ্ঠাভরে এইচ এম ভি-র লাইব্রেরীতে পড়ে থেকে যাবতীয় তথ্য যোগাড় করে ও এই প্রতিবেদককে তা যুগিয়ে প্রতিবেদকের অসীম কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন শ্রীমতি জয়তী গঙ্গে াপাধ্যায়।

পুজোর ছড়া

কই এলে কোথা গেলে
কই মা আমার
কিছুই তো বুঝিবারে
না পারি তোমার।।
সেই অশ্রু সেই ভাব
দেখি দশানন
সেই জ্বরা সেই ব্যাধি
সেই অনশন
এখনো তো সেই কান্না
সেই হাহাকার
তবে মা তোমার আসা
হল কি প্রকার?
এখনো বহে সে ঝড়
নীরবতা নাই
বিজয়ার 'শান্তিজল'
শান্তি কই পাই।।

—১২৯৮ সালের অনুসন্ধান পত্রিকা হতে সংগৃহীত।

ঠে

বেলুড় মঠে দুর্গা পুজো।

রহস্যের একটি সুলুক সন্ধান দিয়েছেন সাহিত্যিক শঙ্কর। তিন বলছেন, এই খিচুড়ি রান্নার মোটামুটি ফর্মুলা হলো যত আতপ চাল তত ভাজা মুগ ডাল, সরষের তেল দিতে হয়, সেই সঙ্গে আদা, কাঁচালঙ্কা, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ইত্যাদি মশলা। ডাল সেদ্ধর পরে এতে চাল পড়বে, হাফ হয়ে যাওয়ার পরে হলুদ গোলা জল, তার পরে তৈরী মশলা এবং আখের গুড়। ঢালবার আগে ড্রামে জিরে ও গরম মশলা। এক সময় এই খিচুড়ি-অন্নে পড়বে গাজর, বীন, ফুলকপি, আলু, কড়াইশুঁটি। এক একটা বড় কড়ার ক্যাপাসিটি ১০০ কেজি চাল ও ১০০ কেজি ডালের, কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীরা তা ৯০ কেজিতেই সীমাবদ্ধ রাখেন। এক কড়া খিচুড়ি রাঁধতে ঘনশ্যাম বাহিনীর লাগে এক ঘন্টা। হাজার পিস লাড্ডু রাঁধতে সময় লেগে যায় দু'ঘন্টা। এবার আসা যাক বেলুড় মঠের টাইম-টেবিলে। দুর্গাপুজোর সময় সব্জি ভাজা শুরু হয় প্রসাদ বিতরণের আগের দিন রাত ন'টা থেকে। তরকারী কোটার কাজে ব্যাপৃত থাকেন ৪০ জন ব্রহ্মচারী ও ৪০ জন সেবক। রান্না শুরু হয় রাত দুটো থেকে। অষ্টমী'র দিন ও পুজোর অন্যান্য দিন সকাল এগারোটার পর থেকেই শুরু হয় ভোগ বিতরণ। খিচুড়ি'র রেসিপির পর গোপনীয় 'খেচরান্নে'র ফর্মুলাটাও ফাঁস করে দিয়েছেন শঙ্কর। প্রতি ১০০ জনের জন্য ১৪ কেজি চাল ও সমপরিমাণ ডাল দরকার এতে। ১ লাখ লোকের জন্য ১৪,০০০ কেজি চাল এবং সমপরিমাণ ডাল ও সব্জী লাগে। সেইসাথে আড়াই হাজার কেজি চাটনি তো লাগবেই। এলাহি কান্ডটা ভাবুন একেবারে! প্রসাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় স্বামীজি প্রবর্তিত দাঁড়া প্রসাদের অর্থাৎ না বসে, দাঁড়িয়ে প্রসাদ গ্রহণ করা। আর এর জন্য যা যা দরকার অর্থাৎ শালপাতার প্লেট, প্লাস্টিকের কাপ সবেরই নিখুঁত আয়োজন বেলুড়ে। এতটুকু বিশৃঙ্খলা নেই। বেলুড়ের আনন্দযজ্ঞে আপনারও নিমন্ত্রণ রয়েছে।

চিঠিপত্র

পাকিস্তানের জন্মরহস্য

স্বস্তিকার ১৭ শ্রাবণ (৩.৮.০৯) সংখ্যায় গূঢ়পুরুষের প্রতিবেদন পড়লাম। এই প্রতিবেদনের জন্য তাঁকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। প্রতিবেদনে তিনি পাকিস্তানের জন্ম রহস্য তুলে ধরেছেন, যা আমাদের অনেকেরই জানা নেই। সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রথম জন্ম হয় আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

একথা পাকিস্তানের জনক কায়েদ-এ আজম মহম্মদ আলি জিন্নাও বলেছেন। তিনি দেশ বিভাগের প্রস্তুতি পর্বে আলিগড়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছিলেন — "আপনাদের চিন্তার ফসল পাকিস্তান রাষ্ট্র"। এই রহস্য আজকের দিনের ক'জন জানে? যারা জানেন সেই কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারের রথী-মহারথীগণ সাম্প্রতিককালে মুর্শিদাবাদে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ কক্ষ তৈরীর জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। মুসলমানদের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র-ছাত্রীদের মাথায় নতুন নতুন মুসলমান রাষ্ট্র গঠনের বীজ বপন করা হয়। এসব একটি প্রাচীন প্রথা। এই প্রথায় সারা পৃথিবী জুড়ে ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি একের পর এক সম্প্রসারিত হচ্ছে। সঙ্কুচিত হতে হতে হিন্দুরা ভারতবর্ষের এক কোণায় এসে ঠেকেছে। সেখানেও হিন্দুদের সহনশীলতা এবং ক্লীব মানসিকতায় ইসলামিক শক্তি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। বিভিন্ন জায়গায় হিন্দুদের উপরে মুসলমান দুষ্কৃতীরা যেভাবে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে, তা দেখে এই কথাই বারবার মনে আসছে। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হলো একমাত্র 'স্বস্তিকা' পত্রিকা ছাড়া অন্য কোনও পত্রিকায় 'মুসলিম আগ্রাসনের সন্ত্রাসবাদী কুকর্মের খবরগুলো প্রকাশ করা হয় না'। হলেও ওগুলো এমনভাবে রেখে ঢেকে প্রকাশ করা হয়, যা সাধারণ ঘটনা বলেই মনে হয়। নিজেদের অধিকার রক্ষা ও অগ্রগতির জন্য যে শিক্ষা এবং সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, মুসলমান এবং খৃস্ট মতাবলম্বী মানুষের কাছ থেকে হিন্দুদেরও তা শেখার প্রয়োজন আছে। তবে বাংলার একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, কিছু লোক দেখে শেখে, কিছু লোক ঠকে শেখে। কিন্তু এমনও লোক আছে যারা দেখে বা ঠেকে কিছুতেই শেখে না। হিন্দুরা এই তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোক। যার ফলেই তারা পৃথিবীর এক কোণে এসে ঠেকেছে। বিলুপ্ত হয়েছে তাদের ক্ষত্রিয় মানসিকতা। রাজনীতির ক্ষেত্রে চলছে তাদের ব্যাপকভাবে মুসলিম তোষণ প্রতিযোগিতা। এই সুযোগ নিয়েই তারা ব্যস্ত প্রশাসনিক পরিকাঠামো দখল করার জন্য। আর এভাবেই জন্ম হবে ভারতের বুকে আর এক পাকিস্তান। বিশেষ করে পূর্ব ভারতে। এই অঞ্চলে প্রশাসনিক দুর্বলতা দেখলে তাই মনে হয়। মুসলিম তোষণ নীতিই যেন শাসক দলের নীতি। লোকে পরিহাস করে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নাম রেখেছে মুসলিম কমিউনিস্ট পার্টি। কংগ্রেসকে বলে, বাংলার কং বং সং। তা যে যাই বলুক ওতে তাদের কিন্তু যায় আসে না। জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মন জয় করে ভোট ব্যাঙ্ক তৈরী করার প্রতিযোগিতায় তারা এক কেন, হাজার মুসলিম রাষ্ট্র তৈরীর কাজে সহযোগিতা করতে পিছু পা হবে না। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দেখলে তাই মনে হয়।

শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা।

নানাজী দেশমুখ

'স্বস্তিকার' ১০ শ্রাবণ ১৪১৬ তারিখের সংখ্যায় (২৭ জুলাই, ২০০৯) চিত্রকূট দ্রষ্টা নানাজী দেশমুখ নিয়ে প্রবন্ধ খুব ভাল লাগল, অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে।

এই সম্বন্ধে একটা খবর জানাই। মহারাষ্ট্রের জালনা নামক শহরে গত ২২ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকদের পরিচালিত জনকল্যাণ সমিতি দীনদয়াল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, চিত্রকূটকে "পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজী পুরস্কার" দিয়ে সম্মানিত করেছে।

ডি আর আই-এর সাথে সেকেন্দ্রাবাদ স্থিত এশিয়ান এ্যাগ্রি হিস্ট্রি ফাউন্ডেশন (Asian Agri History Foundation)-কেও এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। এই সংস্থার প্রাণপুরুষ ডাঃ ওয়াই এল নেনে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন। গোয়ালিয়রের স্বয়ংসেবক ডাঃ নেনে, বিখ্যাত কৃষি বৈজ্ঞানিক। তিনি পৃথিবীতে প্রথম কৃষি বৈজ্ঞানিক যিনি কৃষিতে দস্তা-র উপযোগিতা আবিষ্কার করেন। এই Foundation প্রত্যেক তিন মাসে একটা অত্যন্ত উপযোগী Journal গত ১৩ বছর ধরে প্রকাশ করছেন।

অরবিন্দ ঘোষ, নতুন দিল্লী।

ব্রহ্মাণী মেলা

গত ৬১ বর্ষ ৪৭ সংখ্যা, ১০ শ্রাবণ স্বস্তিকা পত্রিকায় ১১ পৃষ্ঠায়, একটি কলম "প্রায় দু'শো বছরের নাকাশীপাড়ার ব্রহ্মাণী মেলা"। আমার বাড়ী নাকাশীপাড়ার ব্রহ্মাণী মেলার নিকট। আমার মনে হয় উত্তর ২৪ পরগনা জেলার, পরিবর্তে নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া হবে।

বিল্বচরণ বিশ্বাস, নাকাশীপাড়া, নদীয়া

প্রতিবেদকের উত্তরঃ

পত্রলেখকের বক্তব্য সঠিক। অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য দুঃখিত।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার

স্বাধীনতর পর থেকে সারা ভারতে বিভিন্ন কারণে বেকার ছেলে-মেয়ের সংখ্যা ক্রমশ বেড়েছে। এখন ভারতব্যাপী বিভিন্ন রাজ্যে (পঃ বাংলা সহ) নথিভুক্ত পাঁচ কোটির উপর বেকার । এ রাজ্যে ৬৪ লক্ষর মতন। বামফ্রন্ট সরকার ৩২ বছরের মাথায় বেকার ছেলে-মেয়েদের দরদে কর্মসংস্থানের জন্য সংবাদপত্র, টি ভি-তে তৎপরতা দেখালেও, আদৌ বাস্তবে কি রূপ নেবে। একজন হতভাগ্য অবসর প্রাপ্ত শ্রমিক হিসেবে স্নাতক পুত্রের জন্য খোদ রাজ্য সরকার ঘোষিত কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করার প্রায় এক বছর পর গিয়ে দেখলাম বস্তা বস্তা দরখাস্ত পড়ে আছে। অধিকারিকদের জিজ্ঞাসা করলে বলেন — এত দরখাস্ত বাছাই করার সময় নেই। তাই কবে আপনার ছেলের মতো অন্যরা 'ইন্টারভিউর কল' পাবে জানি না। অথচ সব কয়টি দপ্তরের মন্ত্রী হচ্ছে সি পি এম দলের।

সিঙ্গুর থেকে ন্যানো যখন গুজরাটে চলে গেলে তখন মুখ্যমন্ত্রী টি ভি সাক্ষাৎকার-এ বলেছিলেন যে, ন্যানোর উদ্বোধন নিয়ে তিনি চিন্তিত নন। তার চিন্তা সিঙ্গুরে ছয় হাজার ছেলে-মেয়ের কান্নার মুখ। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশ দপ্তরে বিজ্ঞাপন দিয়েও আজ কর্মী নিয়োগ হলো না। কবে হবে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়? এক একটা দরখাস্ত করতে বেকার ছেলে-মেয়েদের ভাল টাকাই খরচ হয়। আমার পুত্র দপ্তরে দপ্তরে কর্মখালির ভিত্তিতে দরখাস্ত করেছে এই পত্রিকার মাধ্যমে, মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনার জন্য।

অরূপ বসু, বৈদ্যবাটী, হুগলী।

জনমত

অশনি সংকেত

হৃষীকেশ কর

স্বস্তিকায় প্রকাশিত পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুল ও ঝাউবোনা হাইস্কুলে নমাজ পড়ার দাবীতে স্কুল কর্তৃপক্ষ অসম্মত হওয়ায় মুসলমানদের দ্বারা স্কুল ও পার্শ্ববর্তী বাজার ও গ্রাম আক্রমণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখা।

স্বাধীনতার আগে থেকেই মুসলমানদের দাবী ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ভারতে তারা সুবিচার পাবে না। তারা ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে পাকিস্তান চায়। হিন্দুরা ভারত বিভাজন চায়নি। তাই ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট তৎকালীন কলকাতায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার সহায়তায় দশ হাজার হিন্দুকে হত্যা করে। পরপর মুসলিম গরিষ্ঠ পশ্চিম ভারতে ও পূর্ববাংলায় দাঙ্গা শুরু হয়। সৃষ্টি হয় পাকিস্তান। অত্যাচারিত হিন্দুরা পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত হল। আজ পশ্চিম পাকিস্তানে ১ শতাংশ ও হিন্দু নেই, পূর্ব বাংলায় যেখানে স্বাধীনতার সময় ২৯ শতাংশ হিন্দু ছিল, আজ সেখানে মাত্র ৮ শতাংশ হিন্দু।

অপরপক্ষে ভারত থেকে স্বাধীনতার পর কিছু মুসলমান পাকিস্তানে চলে গেলেও, বেশীরভাগই ফিরে এসেছে। লক্ষ পূর্ববাংলার লক্ষ মুসলমান মূলত পশ্চিমবঙ্গ, অসম ও ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ করেছে। ভোটের লোভে কংগ্রেস ও সি পি আই এম তাদের বিতাড়ন করেনি। অর্থনৈতিক দুরবস্থা অনুপ্রবেশের কারণ বললেও, এই তিনটি রাজ্যে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা গড়ে তুলে আবার ভারত বিভাজনের দাবীর পথ পরিষ্কার করা হচ্ছে। স্বাধীনতার সময় কেবলমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলায় ৫১ শতাংশ মুসলমান ছিল, আজ মালদা ও উঃ দিনাজপুর সরকারি হিসাবেই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব সীমান্তের প্রায় দশ কিলোমিটার প্রশস্ত জায়গা পুরোটাই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮০-৯০ শতাংশ)। এটা অনুপ্রবেশের সহায়ক। অসমের মোট ২৩টি জেলার মধ্যে নয়টি জেলার ৫৫টি

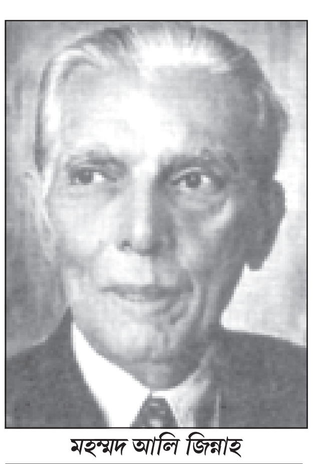

মহম্মদ আলি জিন্নাহ

বিধানসভার ২৮টিতে মুসলিমরা প্রথম ও ৭টিতে দ্বিতীয় স্থানে।

স্বাধীনতার আগের মতো মুসলিমরা ভারতের মধ্যেই দাঙ্গা শুরু করেছে। মনে হয়, এটা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলকে নিয়ে আবার বিভাজনের দাবীর পূর্বাভাস। সংবাদে প্রকাশ, দক্ষিণ বারাসতের গোড়েরহাটের পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুলের ৪ জন মুসলিম শিক্ষক গরমের ছুটির আগেই প্রতিদিন তৃতীয় কালাংশসহ ১ ঘন্টা নমাজ পড়ার ও উপরের একটি ঘরকে মসজিদ হিসাবে ব্যবহারের দাবী জানান। হিন্দু ছাত্ররা আপত্তি জানান কিছুক্ষণের মধ্যেই ৩/৪ হাজার মুসলমান স্কুল আক্রমণ করে ও হিন্দু শিক্ষক ছাত্রদের বেধড়ক মারতে থাকে। পরে গ্রামে ঢুকেও হিন্দুদের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে মারতে থাকে। দ্বিতীয় ঘটনায় ২০০৯-এর গোড়া থেকে মুর্শিদাবাদের ঝাউবোনা হাইস্কুলে নমাজ পড়ার দাবী ওঠে। ছাত্রদের মধ্যে হিন্দুই বেশী। প্রধান শিক্ষক রাজি না হওয়ায় কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েক হাজার মুসলমান স্কুল আক্রমণ করে হিন্দু শিক্ষক ও ছাত্রদের পেটাতে থাকে। ত্রিমোহিনীবাজারে হিন্দুদের দোকান লুঠ করে। বাধা দিলে গুলি করে হত্যা করে। এই সমস্তই ভারতীয় হিন্দুদের কাছে অশনি সংকেত। সরস্বতী পূজা বন্ধের দাবীও এসেছে। লক্ষ লক্ষ মুসলিম অনুপ্রবেশকারী পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে প্রবেশ করেছে। যে সমস্ত জায়গায় তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছে সেখানেই হিন্দুদের উপর অত্যাচার করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল বাড়াতে চাইছে। অবিলম্বে অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিতকরণ ও বিতাড়ন না করলে খণ্ডিত ভারত আবার তার ভূখণ্ড হারাবে। রাজ্য জুড়ে আন্দোলন করে মুসলমানদের বোঝাতে হবে বহুকাল থেকে যে ব্যবস্থা চলে আসছে, সেই ভাবেই সরস্বতী পূজা হবে। ভারতের স্কুলে নমাজ পড়তে দেওয়া হবে না। ঐ অঞ্চলের যেখানে সাধারণের নমাজ পড়ার জায়গা আছে যেখানে নমাজ পড়া যেতে পারে।

হুগলী জেলায় জন্মাষ্টমী উৎসব

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হুগলি জেলার বলাগড় প্রখণ্ডের উদ্যোগে কোলড়া অরুণাশ্রম প্রাঙ্গণে গত ১৩ আগস্ট, জন্মাষ্টমীর দিন সারা দিন ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে নগর সংকীর্তনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে বিভিন্ন মঠ-মন্দির থেকে আসা সাধু-সন্তরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবন ও বাণী সকলের কাছে তুলে ধরেন। এদিন উপস্থিত কচি-কাঁচারা নিজেদের মধ্যে কৃষ্ণ সাজো প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। এদিন প্রায় ছ'শ ভক্ত 'কৃষ্ণ প্রসাদ' গ্রহণ করেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পাশাপাশি দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণেরও আয়োজন করা হয়। সেই সঙ্গে দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে খাতা-পেন তুলে ধরা হয়। এদিন অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকার ব্যবস্থাপক অভিজিৎ রায় চৌধুরী। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাংগঠনিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা তুলে ধরেন। সমগ্র কার্যক্রমটি পরিচালনা করেন হুগলী জেলার পরিষদের সহ-সভাপতি সুশীল ভট্টাচার্য।

◆ ◆ ◆

গত ১৩ আগস্ট বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পাণ্ডুয়া শাখা সারাদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জন্মাষ্টমী পালন করেন। এদিন

সমাবেশ সমাচার

পরিষদের উদ্যোগে, পূজাপাঠ, নাম সংকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ধর্ম সভায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনী, বাণী ও গীতার ওপর বক্তব্য তুলে ধরেন পরিষদের কার্যকর্তারা। প্রবীণ স্বয়ংসেবক মানিক চন্দ্র ঘোষ উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে জন্মাষ্টমীর মাহাত্ম্য তুলে ধরেন। চারশোর ওপর জনসমাগম হয় এই অনুষ্ঠানে।

হাওড়ার নবনারী মেলা এখন কিংবদন্তীর পর্যায়ে

সোমনাথ নন্দী

মেলা কথাটির মধ্যে নিহিত মানুষের আত্মিক সংযোগের দিকটি। মেলা মানবজীবনে মহামিলনের ক্ষেত্র। আভিধানিক অর্থ হল — কোনও পূজা, অনুষ্ঠান, উৎসবকে কেন্দ্র করে জন সমাগম, হাট ইত্যাদি। আসলে বিভিন্ন পালা-পার্বনকে কেন্দ্র করে বাংলার গ্রাম ও ছোট শহরগুলিতে জাঁকিয়ে বসে মেলা। এখানে মানুষ আসে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ডেকে আনতে হয় না বা প্রচারের বাহুল্য দেখা যায় না। মেলায় আসার জন্য সম্বৎসর তাঁরা অপেক্ষা করে তৃষিত চাতকের মতো। কবিগুরুর কথায়, "বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।"

হাওড়া শহরের বাকসাড়া অঞ্চলে এমনই এক প্রাচীন প্রাণবন্ত মেলা নবনারী মেলা। বাংলায় সুবৃহৎ মেলাগুলির অন্যতম এই মেলা আজ জাতীয় লোক উৎসবগুলির পংক্তিভুক্ত।

বাংলার লোক উৎসব বা মেলাগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এদের উৎসে থাকে দুটি চিরাচরিত সত্য। এক, ঐহিক কামনায় তাড়িত আঞ্চলিক দেবতার প্রতি চলে আসা লোকবিশ্বাস। দুই লোককাহিনী বা কিংবদন্তি নির্ভরতা। সাতঘরার (বাকসাড়া) নবনারী মেলায় উদ্ভবের সূত্র ছিল এই কিংবদন্তি।

জনশ্রুতি হল প্রাচীনকালে বাকসাড়া অঞ্চলটি ছিল বনাকীর্ণ। তার মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কয়েকটি ছোট গ্রাম। বসবাস বলতে সাতটি পরিবার মাত্র। সেই থেকে নাম সাতঘরা। এখন অবশ্য গ্রামের চিহ্ন মুছে গিয়ে রয়েছে অতীতের স্মৃতিবাহী সাতঘরা পল্লী।

এই সাতঘরা গ্রামের সাত পরিবারের এক পরিবারে জনৈক কর্তা ছিলেন অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণলীলাভূমি দর্শন মানসে রওনা দেন একদিন তিনি রাসস্থলী বৃন্দাবনের পথে। সেই-ই হল তাঁর শেষ যাত্রা। পরিবারের লোকজন বহু অনুসন্ধান চালিয়ে কোনও খোঁজ পেলেন না তাঁর।

বেশ কয়েক বছর বাদ। ওই পরিবারের বড় ছেলে একদিন বিচিত্র স্বপ্ন দেখলেন। দৃশ্য হল ব্রজধামে শ্রীগোবিন্দ মত্ত এক অদ্ভুত রাসক্রীড়ায়। শ্রীরাধাসহ অষ্টসখীকে নিয়ে হাতির পিঠে হাওদায় আরূঢ়। শ্রীকৃষ্ণের পাশে কেবল বৃষভানুনন্দিনী রাধা। হাতির অন্যান্য অঙ্গে বিরাজিতা ললিতা, বিশাখা, চিত্রা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা প্রভৃতি অষ্টসখী।

স্বপ্নেই আদিষ্ট হলেন তিনি ওইরূপে রাধাকৃষ্ণের পূজার প্রচলন করার। পরদিন প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বপ্নাদেশের কথা জানালেন গ্রামের অন্যান্য পরিবারকে। রাজি সকলে। শুরু হল সেই থেকে গ্রামে রাধাকৃষ্ণ অর্চনা সম্পূর্ণ নূতন আঙ্গিকে। উপাসনার পরিচয় হল নবনারী কুঞ্জর পূজা।

নবনারী কুঞ্জর পূজার শুরু ঠিক কবে; সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় একমাত্র ১৯০৪ সালের (খৃঃ) পর থেকে। অবশ্য এলাকার প্রবীণ বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসা করে একটি বিষয় জানা যায় যে, তাঁদের পিতামহ, প্রপিতামহরা উক্ত পূজায় অংশগ্রহণ করেছেন। সে সূত্র অনুসারে অনুমান করা যায় নবনারী কুঞ্জর পূজা বাকসাড়া অঞ্চলে প্রায় ২৭০ বছরের ঐতিহ্য নিয়ে বহমান।

হাওড়া জেলার ইতিহাস নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে কলকাতার ২০০ বছর আগে হাওড়া জনপদের অস্তিত্ব। প্রমাণ, খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতকে বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের মনসামঙ্গল। সেখানে দেখা যায় চাঁদ সওদাগরের বাণিজ্য যাত্রায় বর্ণনা —

তাহার পূর্বকূল বাজি এড়ায় কলকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারাজা।।

বেতড় (বর্তমানে শিবপুর অঞ্চলে) হাওড়ার পূর্বনাম। কলকাতা ও হুগলির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় এই কাব্যে। একটি বিষয় সুস্পষ্ট যে ভাগীরথীর পূর্বপার কলকাতা যখন মাত্র বাদবনাকীর্ণ, পশ্চিম পারে হাওড়া তথা বেতড় বর্ধিষ্ণু জনপদ। কথিত যে কলকাতার শেঠ, বসাক, বণিক সম্প্রদায় এখানে ব্যবসা করতেন রীতিমতো বড় আকারে। প্রমাণ আরও। ১৫৭৮ সালে এখানে এসেছিলেন ইতালির ভেনিস শহরের এক নাবিক। নাম সিজার ফ্রেডরিক। তাঁর বর্ণনানুসারে, বাওড় (Buttor) বা বেতড় ছিল সপ্তগ্রামের সহায়ক বন্দর। পরে কলকাতা পত্তনের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সুবিধাদানের আশ্বাস পেয়ে শেঠ, বসাক, বণিককুল চলে আসেন এখানে (কলকাতা) ভাগীরথী পেরিয়ে। বেতড় তখন পর্তুগীজদের ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

হাওড়া জনপদ প্রথম পাদপ্রদীপের আলোয় আসে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তৎকালীন দুর্বল মুঘল বাদশা আওরঙ্গজেবের পৌত্র ফারুকশিয়রের কাছে ভাগীরথীর পূর্ব উপকূলে ৩৩ টি গ্রাম ও পশ্চিম তীরে ৫টি গ্রাম ইজারা নেওয়ার জন্য আর্জি পেশ করেন। কোম্পানীর দলিলে পশ্চিম পাড়ের পাঁচটি গ্রামের নাম লেখা হয় শালকিয়া, হাওড়া, কাসুন্দিয়া, বেতড় ইত্যাদি। বাদশা আর্জি মঞ্জুর করেন বার্ষিক ১৪৫০ টাকা খাজনার শর্তে। ১৮৬৪ সালে বাংলা ইংরেজ শাসনাধীনে পূর্ণভাবে এলে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে হাওড়াকে চিহ্নিত করা হয়। এইসব সূত্রই বলে দেয় দক্ষিণে বেতড় থেকে উত্তরে শালকিয়া পর্যন্ত ছিল হাওড়া জনপদের বিস্তার। স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় বাকসাড়ার অস্তিত্ব সেই সময় থেকে। আর সাতঘরার অধিবাসীদের দ্বারা পরিচালিত নবনারী কুঞ্জরের পূজার প্রচলন যে সপ্তদশ শতাব্দীর কোনও এক সময়ে সে কথা মেনে নিতে অসুবিধা হয় না।

পল্লীবাসীদের প্রদত্ত সূত্র অনুসারে নবনারীকুঞ্জের প্রথম পূজাস্থানটি ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলে ননীগোপাল পাল ও তাঁর পুত্র ললিতমোহন পাল গ্রামবাসীদের সাহায্যে ভাঙা দেউলকে নতুন করে গড়ে তোলেন ১৯০৪ সালে। নাটমন্দির তৈরি হয় গোলপাতায় ছাউনিতে। বলা যায় এরপর থেকে নবনারী মেলা আর গ্রামকেন্দ্রিক থাকে না। জাঁকজমকে ভরা লোকউৎসব হয়ে ওঠে।

১৯৪১ সালে অর্থাৎ দেশে অগ্নিযুগের প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত উৎসব ও মেলা চলে সাবলীল গতিতে। এরপর ১৯৪২ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। গোলপাতার ছাউনির নাটমন্দির ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৫০ সালে সেটা নতুন ভাবে তৈরি হয়। কিন্তু ১৯৫০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে আবার ভেঙ্গে যায়। ১৯৬২ সালে পুনরায় তৈরি হয় অংশুপ্রকাশ ভট্টাচার্য ও গোপাল ধাড়ার চেষ্টায়। বর্তমানে পুজো ও মেলা কমিটির তত্ত্বাবধানে নাটমন্দির পাকাপোক্তভাবে নির্মাণ হয় ১৯৯১ সালে।

সুদীর্ঘ অতীত পেরিয়ে গেলেও, বহু বাধার প্রাচীর সামনে মাথা তুলে দাঁড়ালেও, মেলার ধারাবাহিকতায় কোনও ছেদ পড়েনি। বৈশাখী পূর্ণিমায় শুরু যার, শ্রাবণের শেষ রবিবার সমাপ্তি তার। দীর্ঘ তিনমাস ব্যাপী। বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির বাজারে সমস্ত ব্যয়ভার বহন করছেন অঞ্চলবাসীরা হাসিমুখে।

শ্রাবণের শেষ রবিবার হাওড়ায় অন্য দুই লোক উৎসবের দুই দেববিগ্রহ রামরাজাতলার রামরাজা ও সৌমচন্ডী সহ নবনারীকুঞ্জর বিগ্রহের বিসর্জন হয় রামকৃষ্ণপুর ঘাটে। বিসর্জনে সমাপ্তি ঘটে দীর্ঘ তিন মাসের মেলার প্রাণবন্ততা।

ঈশ্বরপুরুষের রঙ্গরস

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

বৈদেহীনন্দন রায়

মানুষের মানসিক কাঠামো অর্থাৎ অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত নবরসে। তা হল — শৃঙ্গাররস, হাস্যরস, করুণরস, রৌদ্ররস, বীররস, বীভৎসরস, অদ্ভুতরস, বাৎসল্য ও শান্তরস। মানব মনের বিভিন্ন

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

সংবেদনশীলতার প্রকাশ এদের ঘিরেই। প্রতিদিনের আনন্দ-বেদনা, হাসি-কান্না, ভয়-স্থৈর্যের নিয়ামক এরাই।

সাধারণ মানুষ যেমন এর বাইরে নয়, ঈশ্বর পুরুষরাও সর্বপাপমুক্ত হয়েও এড়িয়ে যেতে পারেন না এই নবরসকে। বলা যায় এদের ভূমিকা তখন তাদের লীলাসঙ্গী রূপে। তাঁদের হাসি, ক্রোধ, বেদনার মধ্যে সঞ্চারিত থাকে মানুষের মানবিকত্ব গঠনের অভীপ্সা। সাধারণের চেতনাকে তাঁরা জাগ্রত করেন সহজবোধ্য শ্লেষাত্মক হাস্যরসে। যে হাস্যরসে থাকে প্রজ্ঞার দীপ্তি, সত্যের গাম্ভীর্য আর জীবনের বাস্তবতা। তাঁদের রঙ্গরস বা কৌতুক মোহগ্রস্ত মানুষের মানসিক ক্লৈব্য মোচনে। বিষয়াক্ত মনকে তাঁরা জাগ্রত করেন হাস্যরসের স্নিগ্ধ প্রক্ষেপণে। ঈশ্বর পুরুষদের সেই রঙ্গরস নিয়ে এই প্রতিবেদন।

শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজী একদিন এক শিষ্য বাড়ীতে এসেছেন। বাড়ীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে তিনি প্রশংসা করতে লাগলেন। রাত্রে বাড়ির মালিক বৃন্দাবনবাবু এসে বিষয়টি শুনে বেশ উষ্মার সুরে বললেন গোঁসাইজীকে (বিজয়কৃষ্ণ), মশায় বাড়ি পরিষ্কার হোক বা যাই হোক, এখন ভূতের জ্বালাতনে বাড়িতে টেকা শক্ত। গোঁসাইজী মৃদু হেসে বললেন, আপনাকে সাধন দিয়ে (দীক্ষা দিয়ে) আর কিছু হোক বা নাই হোক, ভূতে কিন্তু বেশ বিশ্বাস হল।

গোঁসাইজী শিষ্যদের একদিন বলছেন, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে একটি ভদ্রলোকের বাড়িতে বহুকাল একটি কালীমূর্তি ছিল। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ। ভদ্রলোকের মা প্রতিদিন বিগ্রহের সেবাকাজ করতেন। কিন্তু ব্রাহ্ম ভদ্রলোক বাড়ি এলেই কালী প্রতিমা ফেলে দিতে চাইতেন আর মন্দিরের বারান্দায় নানা অনাচার করতেন। ভদ্রলোক ছিলেন মায়ের ছোট ছেলে। বৃদ্ধা মা'ও বিড়ম্বনা বোধ করতেন। একদিন মা কালী বৃদ্ধাকে স্বপ্ন দিয়ে বলছেন — ওগো সাবধানে থাকিস্। তোর ছোট ছেলে যে বিষম অত্যাচার আরম্ভ করেছে। নিষেধ করিস। আবার এমন করলে তোর বড় ছেলের ঘাড় মটকাবো।

বৃদ্ধা শঙ্কিত হয়ে বললেন — বড় ছেলের কেন মা? ওর তো কোনও অপরাধ নেই। ঘাড় মটকাতে হয় ছোট ছেলের মটকাও। কালী বললেন — ওলো, সে যে আমায় একেবারে মানে না। গ্রাহ্যি করে না। তাকে আমি পারবো না। (যেন ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।)

প্রকৃত মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। আচার্য রামানুজ তখন বৃদ্ধ। শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। আগের মতো আর শক্তি নেই। ভালো করে হাঁটতে পারেন না। শিষ্যরাই তাঁর দেখভাল করেন। রামানুজ শিষ্যদের সাহায্য নিয়েই চলাফেরা করতেন। তবে শরীর সাথ না দিলেও, নিত্য গঙ্গা স্নানের অভ্যাস তিনি ত্যাগ করেননি। ভোর হলেই গঙ্গা স্নানে বের হতেন। স্নান সেরে নিয়মিত পূজাপাঠ। এই ছিল তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস। কখনও ব্যতিক্রম হয়নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তা করে গেছেন।

ভোর বেলায় কোনও ব্রাহ্মণ শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। স্নান সেরে আবার ফিরে আসতেন। পথে ভক্তদের সঙ্গে দেখা হলে, তাদের খবরা-খবর নিতেন। অনেক সময় অনেক শিষ্যর বাড়িও যেতে হতো তাঁকে। শরীর দুর্বল হলেও শিষ্যদের বা ভক্তদের মনে দুঃখ দিতে পারতেন না তিনি। কেননা গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হলে, সন্ত রামানুজই ছিল একমাত্র পথ নির্দেশক। মার্গ দর্শন করাতেন তিনি।

এসমস্ত কিছুই তিনি শিষ্যদের সঙ্গে নিয়েই করতেন। তবে শুধু একজন শিষ্য নয়। তাঁর সঙ্গ দিতেন দু'জন শিষ্য। যখন স্নানে বের হতেন, তখন সাধারণত তিনি কোনও ব্রাহ্মণ শিষ্যকে সঙ্গে নিতেন। ফিরে আসার সময় তাঁর সঙ্গী হতেন অন্য কোনও ভক্ত বা

বোধ কথা

শিষ্য। সাধারণত কোনও শুদ্র বর্ণের শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গা থেকে আশ্রমে ফিরতেন।

তবে রামানুজের এই নীতি অনেকে মেনে নিতে পারেন না। আশ্রমের ভিতর ও বাইরের ব্রাহ্মণ শিষ্যরা তাঁর এই আচরণে অবাক হতেন। অনেক শিষ্যও ঈর্ষা করতেন। কেউ কেউ অভিমান করতেন। অনেকের মতে, রামানুজের উচিত ব্রাহ্মণকেই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া। কিছু দিন চলার পর একদল শিষ্য আর থাকতে পারলেন না, প্রতিবাদ না জানিয়ে। একজোট হয়ে প্রতিবাদ করলেন রামানুজের কাছে। বললেন, মহারাজ, 'আপনি প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান সেরে শুধু কেন শূদ্রের কাঁধে হাত রেখে আশ্রমে ফেরেন?' রামানুজ অবাক হলেন এহেন প্রশ্নে। উত্তরে শিষ্যদের আশ্বস্ত করলেন। হাসতে হাসতে বললেন, তোমরা যাদের শূদ্র বলে বিভেদ কর, আমি চেষ্টা করি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে উঁচু-নীচু জাতের অভিমান কাটিয়ে তুলতে। জাতপাতের এই ভেদাভেদ জলে ধুয়ে মোছা যায় না। সেজন্যই আমি এই নীতির আশ্রয় নিয়েছি। যাতে তোমাদের মধ্যে ভেদভাব মুছে যায়। রক্ষণশীল শিষ্যরাও বুঝলেন, জাতপাতের ময়লা কোনও জলেই ধোয়া যায় না। শুধু মাত্র ব্যবহারই পারে সব ভেদাভেদ মুছে দিতে। গুরুর আচরণ থেকে তাঁরাও শিক্ষা নিলেন। ক্রমে তাঁদের মন থেকেও ভেদাভেদ মুছে গেল।

ঘটনাটি রমানুজের বৃদ্ধ বয়সের। কোনও গল্প কথা নয়।

।। চিত্রকথা ।। হনুমান ও ভীম ।। ২

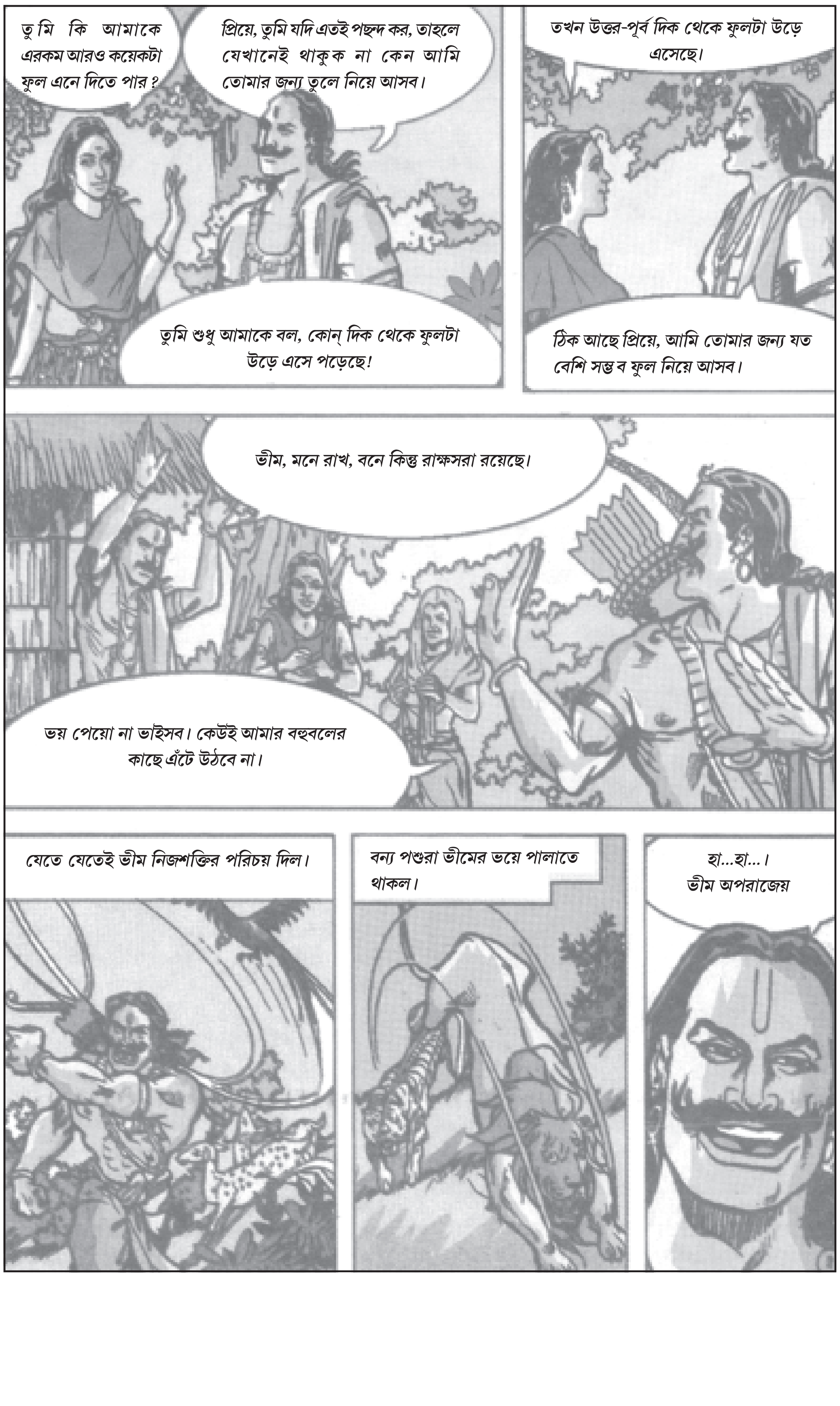

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

পরিবর্তিত আবহাওয়ায় মারণ রোগের প্রকোপ

বিশ্বজুড়ে আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে জীবাণুবাহিত এক-চতুর্থাংশ নতুন রোগের উৎপত্তি ঘটবে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে জলের রাসায়নিক চরিত্রের অদল-বদল ঘটবে। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু রোগের পাশাপাশি বাড়বাড়ন্ত হবে নিত্য-নতুন বিচিত্র রোগের। এছাড়া মাটির গুণগত চরিত্র বদলের ফলে খাদ্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ ঘটবে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার। এর প্রভাবে সারা বিশ্বে বহু মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটবে।

স্থায়ী নকল দাঁত

কলকাতায় এখন পুরোদমে চলছে ডেন্টাল ইম্প্ল্যান্ট — খোলা পরা করতে হবে না। এমন বাঁধানো দাঁত। সম্প্রতি এ এম আর আই মেডিকেল সেন্টার আয়োজিত ডেন্টাল ইম্প্ল্যান্ট সার্জারির ওয়ার্কশপে সিঙ্গাপুরের বিশিষ্ট ইম্প্ল্যান্টোলজিস্ট ডাঃ উইলিয়াম চ্যাং পনেরোটি ইম্প্ল্যান্ট করেন 'আমরি'র সার্জেনদের সহায়তায়। নকল দাঁতের রুট তৈরি করা হয় টাইটেনিয়াম ধাতুর ওপর তরল হাড়ের গুঁড়ো স্প্রে করে। চোয়ালের হাড় ফুটো করে এই রুট ইম্প্ল্যান্ট করা হয় হাড়ের মধ্যে। নকল-দাঁত এই রুটের ওপর স্ক্রু দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। এই পদ্ধতিতে নকল দাঁত বসাতে ব্যথা-যন্ত্রণার ভয় নেই, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ারও সমস্যা নেই।

মোবাইল সংক্রমণ

হাসপাতালের পরিবেশকে স্বাস্থ্যকর বা রোগ-জীবাণু মুক্ত রাখতে জুতো খুলে হাসপাতালে ঢোকা, বিশেষ বিশেষ বিভাগে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা, রোগীর সামনে ভিড় না করা, কথা না বলা ইত্যাকার কঠোর নিয়ম-বিধির পরেও হাসপাতাল, নার্সিংহোম, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো আজ এক-একটি ব্যাকটেরিয়ার আখড়া হয়ে উঠেছে। এর অন্যতম কারণ, অবাধ মোবাইল ফোনের ব্যবহার। এমন তথ্য দিয়েছেন তুর্কির ওন্দোকুস মাইস ইউনিভার্সিটির গবেষকরা। তাঁরা প্রায় দু'শ ডাক্তার ও নার্সের মোবাইল ফোন ও হাত পরীক্ষা করে দেখেছেন, এঁদের মধ্যে ৯৫ শতাংশ মোবাইলের মাধ্যমে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া ছড়াচ্ছে, যার প্রভাবে জটিল ত্বক সমস্যা এবং মারণ রোগ দেখা দিচ্ছে।

শিশুরাও সুরের সমঝদার

দুগ্ধপোষ্য শিশুর সঙ্গে ভাব-বিনিময়ের একমাত্র মাধ্যম সুর। মুখে বুলি ফোটার আগেই সুরের ঝঙ্কার শুনে সে বুঝে যায় চারপাশের পরিবেশ। সুর পছন্দ হলে হাসে, অপছন্দ হলে ভোগে নিরাপত্তাহীনতায়। এক সমীক্ষায় এমনই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন আমেরিকার ব্রায়াম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী রস ফ্লোম। বিটোফেনের মিষ্টি সুর শুনে শিশুরা যেমন অবাক বিস্ময়ে তাকায় এবং ঘাড় ঘুরিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে সুরের উৎস, তেমনি মাইকেল জ্যাকসনের ঝমাঝম পপ বা বিটোফেনের বিরহের সুর শুনে তারা চোখ বন্ধ করে, হাত পা ছোড়ে, কেঁদেও ফেলে। শিশুর প্রখর চেতনাবোধের ফলে মায়ের কণ্ঠস্বর বা চুড়ির টুং টাং আওয়াজ তাদের আকর্ষণ করে বেশি। রাগতস্বরে কথা বললে নিরাপত্তাহীনতায় সে কেঁদে ফেলে।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

— (ব্যাঙ্ক ডাকাতির পর) তুই এদিকটা লক্ষ্য রাখ, আমি ততক্ষণে টাকাটা গুণে দেখি।

— কেন সময় নষ্ট করবি, কালই তো খবরের কাগজে বেরবে ক'লাখ টাকা লুঠ করলাম!

☺ ☺ ☺

বাবা : তোর দুষ্টুমির কথা ভেবেই আমার মাথার অর্ধেক চুল পেকে গেল।

বাপি : হুম, এবার বুঝতে পারছি, দাদুর কেন সব চুল পাকা।

☺ ☺ ☺

(মা অসুস্থ ছেলেকে বিছানা থেকে তুলে ঝাঁকাচ্ছে দেখে) ডাক্তারবাবু : ও কী করছেন?

মা : ওষুধের শিশির গায়ে আপনিই তো লিখে দিয়েছেন, নাড়িয়া খাওয়াইবেন!

☺ ☺ ☺

একজন : এগুলি কাদের ছবি?

পুলিশ : এই খুনীদের আমরা খুঁজছি।

একজন : ফটো তোলার সময় ধরে ফেললেন না কেন?

☺ ☺ ☺

— বাবা, লোডশেডিং-এ তুমি লিখতে পার?

— মনে তো হয় পারব।

— গুড্, আমি আলো নিবিয়ে দিচ্ছি, তুমি চট করে প্রোগ্রেস রিপোর্টের এখানে একটা সই মেরে দাও তো!

—নীলাদ্রি

মগজচর্চা

১। গুরু নানকের পর দ্বিতীয় শিখগুরু কে হন?

২। 'কোথায় একটু জল পাই বলতে পারেন?' কোন্ নাটকের সংলাপ এবং কার লেখা?

৩। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে চীনের কোন্ তীর্থযাত্রী ভারতে আসেন?

৪। কোন রুমে ঢোকা যায় না?

৫। ইংরেজি ভাষায় সিনথেসিস, গ্রাফ ও কপি — এই তিনটি শব্দের আগে কোন্ শব্দ বসে?

—নীলাদ্রি

উত্তর :

১। গুরু অঙ্গদ

২। অবাক জলপান, সুকুমার রায়

৩। ফা-হিয়েন

৪। মাশরুম

৫। ফটো

পৃথিবীর নিয়ম— পুরাতনের স্থান নতুনরা গ্রহণ করে

এমনকী আমি উদ্ধৃত করে বলে দিতে পারি, তারা কি বলেছিল। আর একটা বিষয়, আদবানী এবার নির্বাচনে শহুরে পদ্ধতিতে লড়াই করার জন্যে যে ওয়েবসাইটটির প্রচলন করেছিলেন তার নিন্দা করা হয়েছে আর এস এস-এর প্রকাশনায়।

● এটার সম্বন্ধে বলি, বিভিন্ন ব্যক্তি তাদের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নানান দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করতেই পারেন। কিন্তু আর এস এস-এর দৃষ্টিভঙ্গী কেবলমাত্র সরসঙ্ঘচালক, সরকার্যবাহ এবং সঙ্ঘের পক্ষ থেকে যিনি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার ব্যাপারে দায়িত্ব প্রাপ্ত তাঁরাই তা দিতে পারেন। স্বয়ংসেবকরা স্বাধীন। তাঁরা তাঁদের বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা দিতেই পারেন।

❐ কিন্তু এনিয়ে আপনার ব্যাখ্যাটা ঠিক কি?

● আমি রাজনীতিতে বিশেষজ্ঞ নই। আমাদের স্বয়ংসেবকরা রাজনীতিতে রয়েছেন, বিজেপিতে রয়েছেন। তাঁরা এই বিষয়টা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করুন। তাঁদের যদি মনে হয় এই সমালোচনা যথাযথ নয়, তবে তাঁদের এগিয়ে যাওয়া উচিত।

❐ আপনি বিজেপির সঙ্গে একটা দূরত্ব বজায় রাখতে চাইছেন। কিন্তু আর এস এস ও বিজেপির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে —এটা তো ধ্রুব সত্য।

● ঠিকই বলেছেন, এটা ধ্রুব সত্য। কারণ আর এস এস ও বিজেপি উভয়কেই নেতৃত্ব দান করেন স্বয়ংসেবকরা। হ্যাঁ, বিজেপিতে আমাদের স্বয়ংসেবকরা রয়েছেন। কিন্তু বিজেপি একটা আলাদা রাজনৈতিক দল।

❐ আপনি আদবানীকে আরও পাঁচ বছর কাজ চালিয়ে যেতে বলবেন?

● এটা হতে পারে। কিন্তু এনিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা তিনিই নেবেন।

❐ আপনার এবিষয়ে পরামর্শ কি?

● আমি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা না করে এনিয়ে কোনও পরামর্শ দেব না।

❐ আর এস এস-এ অনেক কম বয়সী নেতৃত্ব রয়েছেন। আপনি ডাঃ হেডগেওয়ারের পরেই সবচেয়ে কমবয়সী হিসেবে এই দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। আপনি খুশী বিজেপির এই পরিস্থিতিতে যেখানে নেতাদের বয়সের প্রথম স্তর পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি বছর, দ্বিতীয় স্তর ষাট থেকে পঁচাত্তর বছর।

● বিজেপি এটা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিক। এটাই পৃথিবীর নিয়ম, পুরাতনের স্থান নতুনরা গ্রহণ করে। যুব সমাজ নিষ্ফলা নয়। কিন্তু কোথায় এবং কখন— এটা তাদের ভাবতে হবে। তবে আপনি বললেন বিজেপির নেতাদের আজকের বয়সের কথা। কিন্তু ত্রিশ বছর আগে এদেরই বয়সের অন্যরকম পরিস্থিতি ছিল। তাঁরা আজ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর কাজ করার পরে বৃদ্ধ হয়েছেন। এবার এটা তাঁরা ভাবুন, কম বয়েসী ভবিষ্যত প্রজন্মকে কিভাবে তাঁরা সামনে আনবেন। এর মোডাস অপারেন্ডি (কার্যপ্রণালী)-টা তাঁদেরকেই নির্ধারণ করতে হবে।

❐ কিন্তু রদবদল জিনিসটা খুবই দরকার।

● সবার ক্ষেত্রেই এটা দরকার। শুধু বিজেপি বলে নয়, আর এস এসও প্রতি দশ পনেরো বছর অন্তর এটা নিয়ে ভাবে।

❐ কিন্তু আপনি কি মনে করেন এই রদবদলটা আগামী নির্বাচনের সময় পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে?

● সেটা আপনারা বিচার করুন। ইউ আর দি জাজ্‌।

❐ ইউ আর অব্ দ্য ভিউ। আপনি সামগ্রিক পরিস্থিতিটার ওপর নজর রাখছেন। রদবদলটা জরুরী। কিন্তু আমি বলতে চাইছি এই রদবদলটা কি বিজেপির পক্ষে আগামী নির্বাচনের জন্যেই বেশি জরুরী? তাদের কি এখনই নতুন নেতৃত্বকে তুলে আনা উচিত নয়?

● অবশ্যই। কিন্তু কিভাবে তাঁরা এটা করবেন সেটা তাঁদের ব্যাপার।

❐ কিন্তু এ ব্যাপারে আপনি আদবানীর সাথে কোনও কথা বলেছেন?

● হ্যাঁ, সেটা ২০০৩ থেকেই বলছি। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, এ নিয়ে কি করা উচিত? আমি বলেছি, আপনার হাতে অনেক যুব নেতৃত্ব রয়েছেন। তাঁদের ধীরে ধীরে তুলে আনুন। এটা প্রকাশিতও হয়েছে।

❐ এই বক্তব্যটা কি সব স্তরের জন্য নাকি শুধুমাত্র ওপরের স্তরের জন্য?

● রদবদলটা সব স্তরের জন্যই। তবে সবক্ষেত্রেই বয়সের গড়টা মেনে চলা দরকার।

❐ গড় বয়স কত রাখবেন?

● আমি রাজনীতির কথা বলতে পারবো না। তবে সঙ্ঘের ক্ষেত্রে আমার স্তরে গড় বয়স হওয়া উচিত ষাট। ষাটের বেশী হওয়া উচিত নয়। পঞ্চান্ন থেকে ষাটের মধ্যেই হওয়া দরকার।

❐ আপনার বিচারে পরিবেশ - পরিস্থিতি, স্থান-কাল দেখে-শুনে পঞ্চান্ন থেকে ষাট বছরের মধ্যে বিজেপি'র পরবর্তী কোন নেতৃত্বকে তুলে আনা উচিত বলে আপনি মনে করছেন?

● না, না। আমি কেবল আর এস এস-এর কথা বলেছি। রাজনীতিতে ওই বয়সটা কত হবে সেটা যাঁরা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন।

❐ নিশ্চয়ই সেই বয়সটা আশি হবে না।

● (হেসে) সেটা তাদের ব্যাপার।

❐ আমি সমর্থন করছি আপনাকে যে আপনি বলছেন, বিজেপিই হিন্দুত্বের প্রকৃত সত্তা নয়, কিন্তু মি. ভাগবত, আপনারা দীর্ঘদিন বিজেপির সঙ্গে জড়িত। বিজেপিও আর এস এস-এর সংস্পর্শে আছে বলে গর্বিত। বহু অনুষ্ঠানে বিজেপি ও আর এস এসকে পাশাপাশি দেখা যায়। আপনারা প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও, পরামর্শদাতার ভূমিকায় রাজনীতিতে রয়েছেন। আপনি খোলাখুলি বলুন, আগামীদিনে বিজেপি কোন পথে চলবে? সরাসরি বলুন সাংগঠনিক পরিকাঠামোরই বা কোন দশা ঘটবে?

● আমি সব কিছু খোলাখুলি ভাবেই বলছি। আমি মনে করি অপ্রত্যাশিত ভাবেই বিজেপি বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে তারা তাদের ভারসাম্য কিছুটা হলেও বিঘ্নিত করেছে। যা চলছে সবকিছুই ভাল চলছে না। এটা শুধু আমিই বলছি না, তাদের জাতীয় কর্মসমিতিও এই বিষয়ে আলোকপাত করেছে। আমি জানি, বিজেপির সব নেতাই এটা অনুভব করতে পেরেছেন। যাতে তাঁরা তাঁদের ভারসাম্য দ্রুত পুনরায় ফিরে পান, তার জন্য আমি সবকিছুই দিতে প্রস্তুত। তাঁরা তাদের চিন্তন বৈঠকে দোষ ত্রুটিগুলো খুঁজে বার করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের ভুলগুলি শুধরে নেবেন বলে আমি নিশ্চিত।

❐ আপনি বলছেন যথাসময়ে সবকিছু থেমে যাবে?

● হ্যাঁ। এটা এখন বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে। তাই থামানো দরকার।

❐ আপনি জানেন, নির্বাচনে পরাজয় নিয়ে রাজনীতির জন্য খান্ডুরীকে সরে যেতে হয়েছে বা বিহারে সুশীল কুমার মোদীর বিরুদ্ধে একটি বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠী সরব। বসুন্ধরা রাজে সিন্ধিয়াকেও সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, তিনি তাঁর সমর্থনে বিধায়কদের প্যারেডেও অংশগ্রহণ করিয়েছেন। এই গোষ্ঠীকোন্দলগুলোকে আপনি কিভাবে দেখছেন?

● এটা পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটির জন্য হচ্ছে। তবে আমি নিশ্চিত খুব তাড়াতাড়িই এই ত্রুটি মুক্ত করা যাবে। তাঁরা এই

বিষয়গুলিতে তাঁদের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং এটা দ্রুতই পুনরুদ্ধার করা যাবে।

❐ আমার মনে হচ্ছে তিনটি কারণে এই জিনিসগুলি ঘটছে। প্রথমত, পার্টিতে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই, দ্বিতীয়ত, উচ্চ নেতৃত্ব দুর্বল, তৃতীয়ত সমষ্টিগত (Collective) নেতৃত্বের অভাব। এর মধ্যে কোনটার প্রভাব সবচেয়ে বেশি বলে আপনার মনে হয়?

● বিজেপি'র অভ্যন্তরে কি ঘটছে, না ঘটছে সেটা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। সেটা আমার কাজও নয়। আমি তাদেরকে শুধু বলতে পারি একত্রিত হতে, চিন্তা-ভাবনা করতে এবং যাই বেরোক না কেন (পত্র-পত্রিকায়) তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত করতে। তাদেরকে নিজেদের নিয়ে ভাবতে হবে। কারণ তাদের দলের একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য রয়েছে। সেই লক্ষ্য নিজের বুকে সবসময় ধারণ কার উচিত। তারা কি করছে এটা তাদেরকেই ভাবতে হবে। এটা তাদেরই ভাবা উচিত। আমি রাজনীতি সম্বন্ধে কিছুই জানি না। তাই যা করার তাদেরকেই করতে হবে। আসলে দৈনন্দিন রাজনীতি, ভোটের ব্যাপার—এগুলোর সঙ্গে যাঁরা জড়িত তারাই রাজনীতির বিষয়গুলো ভালো বুঝবেন।

❐ মি. ভাগবত আপনি সেটা বলেছেন। আমি আপনার প্রশংসা করছি কারণ সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক হিসেবে আপনি রাজনীতিতে আগ্রহী নন। কিন্তু একই সঙ্গে একটা বড় প্রশ্ন — বিজেপিতে রাজনাথ সিং-এর নেতৃত্ব নিয়ে কি ভাবছেন? আপনি বিজেপির অন্য অনেক নেতৃত্বের বিষয়ে বলেছেন। কিন্তু আমি স্রেফ এখন জানতে চাইছি, নির্বাচন পূর্ব ও নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে রাজনাথ সিং-এর ভূমিকাটা আপনি কিভাবে দেখছেন?

● আমি মনে করি, অমুক অথবা তমুক — কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির ভূমিকা এইভাবে দেখার পরিবর্তে পার্টির সাধারণ অবস্থাটারই পর্যবেক্ষণ করা দরকার। আমি সব ব্যক্তিকেই সেখানে অন্তর্ভুক্ত করব। আমি এই জিনিসটাকে এভাবে দেখছি না যে — ওখানে রাজনাথজী আছেন, ওখানে আদবানীজী আছেন, ওখানে অমুক আছেন, সেখানে তমুক আছেন। দায়টা সবারই। তাই সবাইকে মিলেই হৃত অবস্থা পুনরুদ্ধার করতে হবে।

❐ কিন্তু সাধারণের ধারণা উচ্চ নেতৃত্বের দলীয় কোন্দলের জন্যই দলের এই হাল হয়েছে।

● সেটা তাঁরা বলতে পারবেন কেন এমন হয়েছে। ওটা দলের ভাবনা। তবে কোনও নেতারই নিজের জন্য ভাবা উচিত নয়। দলীয় ভাবনারই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।

❐ আপনার সঙ্গে আদবানীর সম্প্রতি দেখা হয়েছিল। তাঁকে কি আপনি পদত্যাগের কথা বলেছেন?

● আমি আমার বক্তব্যে অনড়। আমি আদবানীজীকে কোনও কথাই বলিনি। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। আমি সেদিন নাগপুরে ছিলাম না। দিল্লীতে ছিলাম। তিনি এসবই জানতেন। তাই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। আমি আপনাকে এখন যা বললাম, তাঁকেও সেদিন তাই বলেছিলাম। আমি তাঁকে বলেছিলাম, আপনাদের দল একটা শৃঙ্খলাবদ্ধ দল, একটা অন্যরকম রাজনৈতিক দল (আ পার্টি উইথ আ ডিফারেন্স)। আপনি ভাবুন তাহলে আপনাদের এহেন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো কি করে? আপনারা সেই অন্যরকমটা (difference) পুনরুদ্ধার করুন। ব্যক্তিগত মৈত্রীসঙ্ঘগুলি থেকে তফাতে থাকুন। আপনাদের চিন্তন বৈঠকে সব ত্রুটিগুলি খতিয়ে দেখুন এবং এর সমাধানকল্পে ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করুন। তিনি এবিষয়ে সহমত হলেন। আসলে আদবানীজি আমায় দুঃখ করে বলছিলেন, তিনি জনসঙ্ঘের আমল থেকেও কাজ করেছেন। কিন্তু এরকম পরিবেশের মধ্যে কখনও পড়েননি। আমি তখন বললাম, আদবানীজী আপনি একজন বরিষ্ঠ ব্যক্তি, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি। আপনি জানেন, কি করতে হবে। আপনি সবাইকে ডাকুন, সেইমতো পরামর্শ করে একটা উপায় বার করুন, তারপর সেই পথে চলুন।

❐ আপনি এ বিষয়ে আদবানীকে কোনও নির্দেশিকা দিলেন? মানে বিজেপিতে তাঁর ভূমিকাটা কিরকম হবে? — একজন পরামর্শদাতা ব্যক্তি হিসাবে এই রদবদলকে ঠিকমতো চালিত করবেন বা অন্য কিছু?

● আমি জানি, তিনি একজন বরিষ্ঠ ব্যক্তি, সম্মানীয় ব্যক্তি। তিনি কিছু বললে, দলের সব কর্মীরা সেই কথা মানবেন।

❐ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আর এস এস চাইছে বিজেপির সব স্তরে পরিবর্তন সাধন করতে। এনিয়ে কয়েকজন বিজেপি নেতা খুবই উদ্বিগ্ন। আপনি বলতেই পারেন, কেন্দ্রীয় স্তরে, রাজ্যস্তরে, জেলা স্তরে বিভিন্ন প্রতিভা রয়েছে। কিছু কিছু লোক এটা বলছেন যে আপনারা 'কামরাজ' পরিকল্পনায় চলছেন। আপনার সেন্টিমেন্টকে শ্রদ্ধা করি বলেই আপনার জন্য এই প্রশ্নটার একটা বিকল্পও রাখছি। বিজেপিতে পরিবর্তনের এই ব্যাপারটা আপনি কিভাবে দেখছেন?

● আমি আগেই বলেছি যে আমাদের স্বয়ংসেবকরা বিজেপিতে রয়েছেন। আমি মনে করি প্রথমত, আমাদের আদর্শকে সেখানে যুক্তিগ্রাহ্য ভাবে স্পষ্টভাষায় তুলে ধরা উচিত। দ্বিতীয়ত, আপনার অবশ্যই সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার একটা প্রক্রিয়া থাকা উচিত। যেটাকে আমরা টিম ওয়ার্কিং বলি। তৃতীয়ত, আপনার যেমন একটা কথা (dialouge) থাকবে। তার সাথে থাকবে আপনার ভাবনা চিন্তার সঙ্গে সমমনস্ক কিছু বন্ধু (thought brothers)। যেমন ধরুন অনেক শুভানুধ্যায়ী রয়েছেন, অনেক সংগঠন — এরকম অনেকে রয়েছেন যারা হয়তো সেই অর্থে স্বয়ংসেবক নন। কিন্তু তারা বিজেপি'র সঙ্গে রয়েছেন। তাদের সঙ্গে নিরন্তর কথাবার্তা চালানোর একটা পদ্ধতি থাকা দরকার। এই যোগাযোগটা বিচ্ছিন্ন হতে দেওয়া চলবে না। চতুর্থত, তাদের একটা অন্যরকম রাজনৈতিক দল হওয়া জরুরী (দে সুড বি আ পার্টি উইথ ডিফারেন্স)। আমি এতক্ষণ ধরে এই কথাটাতেই আসতে

(এরপর ১৪ পাতায়)

যুবসমাজ নিষ্ফলা নয়

(১৩ পাতার পর)

চাইছিলাম। যে তাদের একটা অন্যরকম রাজনৈতিক দলে পরিণত হওয়াটা জরুরী। কারণ এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য। পঞ্চ মত, একই সাথে তাদেরকে আরও প্রসারিত হতে হবে এবং সেটা চতুর্থ প্রজন্মের মধ্যে। এই ব্যাপারগুলো স্বাগত। এবং যেটা প্রশ্ন করা হলো, এটা ঠিক যে বিজেপিতে স্বয়ংসেবকরা রয়েছেন। কিন্তু বিজেপি'র একটা স্বতন্ত্রতা রয়েছে। বিজেপি আর এস এস-এর দ্বারা পরিচালিত হয় না। তাই তাদেরকেই উপায়টা খুঁজে বার করতে হবে। তারা এই বিষয়গুলোর সাথে সহমত হতে পারে বা নাও হতে পারে। তারা এব্যাপারে স্বাধীন। কিন্তু আমাদের স্বয়ংসেবকরা সবসময় আমাদের সঙ্গে আছেন। তারা পুরো জিনিসটা খেয়াল করবেন।

❐ আপনি বললেন যে স্বয়ংসেবকরা আপনাদের সাথে রয়েছেন। এতে তো বিজেপি-র লোকেরা রাজি হবেন না। মানে আপনার কথামতো, আর এস এস রাজনৈতিকভাবে বিজেপিকে পথ-প্রদর্শন করাতে গিয়ে রাজনীতিতে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ছে। আপনি এর পেছনে বিজেপির কোনও অস্তিত্ব দেখছেন।

● না। এরকম কিছু ঘটনা এখনও অবধি ঘটেনি এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে না। কারণ বিজেপিতে যাঁরা স্বয়ংসেবক নন, তাঁদের সঙ্গে ও আমাদের সম্পর্ক খুব ভাল।

❐ এটা খুব ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, কারণ আমি দেখছি বিজেপিতে আপনাদের প্রভাবের একটা বৃহত্তর অনুশীলন ক্ষেত্র রয়েছে। যাই হোক, মিঃ ভাগবত, এই সাক্ষাৎকারে আপনাকে সরাসরি প্রশ্ন করার একটা সুযোগ আমাকে দিন। আমাকে বলুন, আমাদের দেশের ৬৫ শতাংশেরই বয়স ৩৫-এর নিচে। বহু মানুষ রয়েছেন যাদের বয়স ৪০-এর মধ্যে। আপনি কি মনে করেন এঁরা বরুণ গান্ধীর বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হবেন? একদম সরাসরি প্রশ্ন করছি। বরুণ গান্ধীর বক্তব্য, সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিনা তা জানতে চাইছি না। যে যুব ভারত (ইয়ং ইন্ডিয়া)-এর সঙ্গে আমাদের সহাবস্থান তারা ভবিষ্যতে কিভাবে পরিচিত হবে?

● যুব সমাজের সঙ্গে আমার অভিজ্ঞতাটা হলো, তাঁরা আমাদের জানেন, তাঁরা হিন্দুত্ব সম্পর্কে, দেশপ্রেম সম্পর্কে আর কর্মসংস্থান (সার্ভিস)-এর ব্যাপারে সচেতন। এখন এই ধরনের ভাবনা চিন্তা করা লোকের সংখ্যাই যুবসমাজের মধ্যে সর্বাধিক। তাঁদের কাছ থেকে আমরা ভালই সাড়া পেয়েছি। বরুণ গান্ধী বিশদে কি বলেছেন, সেটা আমি পরীক্ষা করে দেখিনি। কিন্তু এর পেছনে একটা উচ্চ-চিন্তা অবশ্যই কাজ করেছে। তার দু'টো তিনটে বাক্যই চূড়ান্ত জনপ্রিয় হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এর পেছনে যে একটা সংশ্লিষ্ট উদাহরণ কাজ করেছে তা কিন্তু কোথাও উল্লিখিত হয়নি। আমি এই ব্র্যান্ডের সঙ্গে পরিচিত নই। এটা আমি বলছি না। কিন্তু তাঁর সামগ্রিক বক্তব্যটা দু'তিন বাক্যে তুলে ধরা ঠিক নয়। কলেজ ছাত্রদের কাছ থেকে আমরা এনিয়ে ভালই সাড়া পেয়েছি।

❐ আপনাকে আমি শেষ প্রশ্ন করব। পরবর্তী বিজেপি সভাপতি কে হবেন?

● (হেসে) আশ্চর্য! সেটা আমি কি করে বলব?

❐ না, আমি জানি সেটা। কিন্তু যেটা বলতে চাইছি পরবর্তী বিজেপি সভাপতি অবিলম্বে ঘোষিত হবে। অরুণ জেটলি, বেঙ্কাইয়া নাইডু, যিনি এব্যাপারে খুবই আগ্রহী; সুষমা স্বরাজ, নরেন্দ্র মোদী....। চারজনের কথা বলা হল কিন্তু পঞ্চ ম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এঁরা কারা হবেন?

● এটা সম্পূর্ণভাবে বিজেপির ওপর নির্ভর করছে। তবে এই চারজন বাদ দিয়ে, আমি মনে করছি না যে দলে দৃঢ় (stable) ব্যক্তির অভাব রয়েছে। তাঁরা যাঁকে চান তাঁকেই আনতে পারেন।

❐ আপনি বললেন, এতজন সরসঙ্ঘচালক রয়েছেন বিজেপিতে, আপনি তাদের খুব ভালভাবেই জানেন। সুতরাং কোন প্রতিভার আগামী দিনে ওই পদে (বিজেপি সভাপতি) আসীন হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

● এতজন সরসঙ্ঘচালক!

❐ দুঃখিত, দুঃখিত, খুবই দুঃখিত। আসলে বলতে চাইছিলাম এতজন স্বয়ংসেবক সেখানে রয়েছেন......

● হ্যাঁ।

❐ ওই পদে (বিজেপি সভাপতি) হিসাবে বসার মতো প্রতিভাবানদের সংখ্যা কি খুবই সীমিত?

● না, না। আমি যেটা বলতে চাইছি, ধরুন কোনও কারণে ওই যে চারজনের কথা আপনি বললেন তারা কেউই সভাপতি হতে না পারলেও, এটা যে কোনও কারণে হতে পারে, হয়ত তাঁদেরকে নিজের জায়গাতেই কোনও কারণবশত রেখে দেওয়া হলো। তাহলেও অন্য কোনও যোগ্যতম ব্যক্তিই সভাপতি হবেন।

❐ আপনি কতদিন থাকবেন?

● (হেসে) আগে আমি পঁচাত্তর-আশিতে পৌঁছই। তারপর এটা নিয়ে ভাবব। এখন আমাকে কে চেনে? সুতরাং দেরী আছে।

❐ (হেসে)-খুব ভালো। আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পেলাম। আমার মনে হয়েছে আপনি কিছু কথা অন্তরঙ্গভাবে, অকপটে বলেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ।

● ধন্যবাদ।

রঙ্গম

জেলায় জেলায় শিশু সাহিত্য সম্মেলন

দীপেন ভাদুড়ী।। শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশ এবং চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে বর্তমানে বিভিন্ন শিশু সাহিত্য সংগঠন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শিশু সাহিত্যিক এবং শিশুদের নিয়ে কবিতার অনুষ্ঠান করে চলেছে।

এই সব পত্রিকার সংগঠকরা অনেকদিন থেকে শিশু আকাদেমির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা সরকারকে অনুরোধও করেছিলেন। সম্প্রতি সরকারি প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে বাংলা আকাদেমির ন্যায় শিশু কিশোর আকাদেমি।

এছাড়াও বিভিন্ন শিশু কিশোর পত্রিকার সম্পাদকগণ, শিশু কিশোর পত্রিকার উন্নতিকল্পে এবং শিশু কিশোর উপযোগী সাহিত্যে তাঁদের আগ্রহ সঞ্চার করার জন্য একত্রিত হয়ে গঠন করেছেন "শিশু পত্রিকা সম্পাদক কল্যাণ সমিতি"।

১৮ এবং ১৯ এপ্রিল '০৯ অনুষ্ঠিত হলো শিশু সাহিত্য উৎসব, দক্ষিণ ২৪ পরগণার খেয়াদহ হাইস্কুলে। এই দু'দিন শিশু কিশোর, শিশু সাহিত্যিকদের শিশু সাহিত্য নিয়ে উন্মাদনা পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে শিশু সাহিত্য উৎসব ছড়িয়ে পড়ছে বিভিন্ন জেলায়। এটি সুস্থ সামাজিক লক্ষণ।

গত ২৬ জুলাই উত্তর ২৪ পরগণায় শিশু সাহিত্য উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো বারাসাত বিবেক সংঘের সভাগৃহে। এই উপলক্ষে 'শোরগোল' পত্রিকার সৌজন্যে "আলোর ফুলকি" শিশু পত্রিকা প্রকাশিত হল। এটি একটি উচ্চ মানের শিশু পত্রিকা।

ওই উৎসবের উদ্বোধক ছিলেন নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের কেন্দ্রীয় সম্পাদক ডঃ রাসবিহারী দত্ত। প্রধান অতিথি ছিলেন ডঃ পবিত্র সরকার। সারাদিন শিশুদের এবং শিশু সাহিত্যিকদের প্রবল উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়। এই উৎসবে সহযোগী পত্রিকাগুলি শোরগোল, মিষ্টি কথা, হাঁটাহাঁটি পা-পা, মহীরুহ প্রভৃতি।

এই প্রতিবেদক প্রতিটি শিশু উৎসবে উপস্থিত হয়ে বহু শিশু সাহিত্যিকের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন এবং উত্তরোত্তর উপলব্ধি করেন উত্তোরত্তর দিশাহীন শিশুদের সুস্থ ভাবনার জায়গায় সাহিত্য আগ্রহ সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে। কয়েকজন শিশু সাহিত্যিক এই প্রতিবেদককে জানালেন যে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা থেকে শিশুদের বাঁচাতে এই ধরনের শিশু সাহিত্যের উৎসব হওয়া উচিৎ।

গত ৯ আগস্ট বর্ধমান জেলায় সারাদিন ব্যাপী শিশু সাহিত্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

নিখিল ভারত শিশু সাহিত্য সম্মেলনের কর্মকর্তারা জানালেন ১৯৬১ সালে উৎপল হোম রায়, মৌমাছি (বিমল ঘোষ), স্বপন বুড়ো (অখিল নিয়োগী), খগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং বহু ভাষা-ভাষী শিশু সাহিত্যিকরা তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহযোগিতায় গড়ে তোলেন এই সংগঠন।

উত্তর ২৪ পরগণা শিশু উৎসবের উদ্যোক্তারা জানালেন সাহিত্যিকদের কাজ সমাজকে সঠিক পথ দেখানো। প্রয়োজন প্রচলিত ধারা পথের সময়োপযোগী সংস্কার। গ্রহণ বর্জন সব কিছুই আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। তবেই সম্মেলন করা সার্থক হবে। আমাদের পথ অনুসরণ করে আরও অনেকেই এগিয়ে আসবেন এ ধরনের শিশু সম্মেলন করার জন্য। সিলেবাসের পরেও সাহিত্যে আগ্রহ প্রকাশের সহায়তা করতে। আমাদের আনন্দ এখানেই। ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সুষ্ঠু বাতাবরণের ভিতর নিয়ে আসা। তাহলে গড়ে উঠবে এক নতুন স্বচ্ছ ভারত।

বাহারে, শ্রী মুখের কী ভাষা রে

বিশাখা বিশ্বাস

প্রলয়কলার মান্দাসে উনি রোজই দেখেছিলেন 'সূর্যোদয়', আবার কখনও হাতে নিয়ে উন্নয়ণের ডালি কখনও যেতেন শিল্পের অভিসারে। দুর্গম পথে শূন্য নির্জন মুক্ত ব্যর্থতায় আশ্চর্য নীরবতায় মগ্ন ছিলেন তিনি, তার নাগাল পেতো না কেউ। এখন ভাবছেন রক্তের মানচিত্র বানাবে লাল বামবাদ— সেই মানচিত্র হাতে নিয়েই বারে বারে লালবাদ ঘোড়া ছোটাবে। নিঃশ্বাসে বিষাদমাখা বিষ নিয়ে নন্দীগ্রামের অনাবৃত সত্যের শেষ আবরণটুকু হারিয়ে গেলেও ট্রিগারের ধর্ম থেমে থাকে না। অন্ধকারেই সে লিখে যায় আবার মংগলকোটের নাম!

হাঁ, সেই মংগলকোট। যে মংগলকোট নিয়ে নাচে তার মোহনীয় চিকুর। নয়ন যেন রসকূপ। মোহনগ্রীবা ঝাঁকিয়ে কেমন রংগময় ছাঁদে কাঁধ দুটি তার নাচে। তার প্রমত্ত বাক্যোচ্ছ্বাস যেন গ্রাস করতে চায় সমস্ত আকাশ। আত্মহীনতার রহস্য কথায় যেন গ্রাস করতে চান তার নিজেরই আত্ম-উচ্চারণ। সেই মংগলকোটের প্রসঙ্গেই তাকে বলতে হয়, 'মুখের কী ভাষা...'।

কিন্তু, কোন্ মুখে কিসের ভাষায় কথা বলবেন তিনি? তিনি তো চান সেই রাজ্য, যেখানে আকাশ ভেহিকেলের বেভুল ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার হয় না, মদ যেখানে চালনা করে না মানুষকে, কিষান যেখানে খাটে প্রদীপের উজ্জ্বল আলোর আশায়, পুলিশ যেখানে 'গেঞ্জি' কিংবা 'চটি' পরে শাসনের অধিকার পায় না, যেখানে কান পীড়িত হয় না পথের কান্নায়।..

কিন্তু, মুখের ভাষার প্রশ্নটা ফুরায় না। কারা যে কোন্ মুখে কখন কী বলে যায়, তার খেয়াল রাখে না কেউ। 'আমরা' আর 'ওরা'র তত্ত্ব মুখ্যমন্ত্রী হয়েও বলেছিলেন কে? কে বলেছিলেন, ঢিল মেরে পাটকেল খেয়েছিল কারা? কে বলেছিলেন, 'কেমিক্যাল হাব হতে দেবেন না, দেখে নেবো কার কত ক্ষমতা।'? বিজেপিকে কে বলেছিলেন, 'মাথা তুলতে চাইলে মাথা ভেঙে দেবো'? আর এস এস-কেও 'মাথা ভেঙে দেবো' কে বলেছিলেন? পুলিশকে কে বলেছিলেন, 'চার্জ দেম আউট'? কে বলেছিলেন, 'ওসব মানবাধিকার-টধিকার আমি বুঝে নেবো'? মনে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী?..

সেই মুখ্যমন্ত্রী আবার বলেছেন, 'আমি বললাম, এসব কী, এক্ষুনি স্কুলবাড়ী ছাত্র-ছাত্রীদের ছেড়ে দেন, তবেই ওখানে আমি যাবো।' এক্ষুণি শিক্ষা চাই। উদারনীতির শিক্ষা— যে শিক্ষান্তে বুড়ো বয়সে বিজেপি হন ভূপেন হাজারিকা। নাটুকে বাবুর ক্রাইটেরিয়া উন্নয়ণের ধাপ— বত্রিশ বছরে শিক্ষা নাই, স্বাস্থ্য নাই, বিদ্যুৎ নাই, রয়েছে কেবল দুঃশাসনের পাপ। সংবাদ এখন কমোডিটি, বিশ্বায়নের পণ্য— সত্য মরে গেছে, দুঃখ হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টার জন্য। কেননা, হাজারো

> **বিজেপিকে কে বলেছিলেন, 'মাথা তুলতে চাইলে মাথা ভেঙে দেবো'? আর এস এস-কেও 'মাথা ভেঙে দেবো' কে বলেছিলেন? পুলিশকে কে বলেছিলেন, 'চার্জ দেম আউট'? কে বলেছিলেন, 'ওসব মানবাধিকার-টিকার আমি বুঝে নেবো'? মনে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী?..**

লাশ কাঁধে নিয়ে চলেছে মা, মাটি, মানুষেরা— এখন লালগড়ে জঙ্গলমহলে জঙ্গল কেটে চলেছে মানুষের সন্ধান। হয়তো চলবে সেই দুই টাকা কেজি দরের চালদান। মরা রাতে লাল তারারা রক্ত ঝরাচ্ছে, ঘরপোড়া ভিটেমাটি ছাড়া মানুষের ক্রোধ জমাটি গুড়ের মতো দানাবাঁধা। লাল দলের সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা মন্ত্রীটি ২০১১ সালের ভোটের জন্য স্থির লক্ষ্যে একনিষ্ঠ। কর্মসংস্থানের বুকনি ভালো। আরও ভালো কর্ম সংস্কৃতির তত্ত্ব। সেই জন্যই তো 'ডু ইট নাউ'।...

মার্কসবাদের সব গর্ব শেষ করে দিয়েও 'টাটার গর্ব বুঝি ছাড়ে না' ঠাকুর! কিন্তু 'উচ্চ আস্ফালনে দারিদ্র রুধির পুষ্ট বিলালো লালনে'। কমরেড রেজ্জাক মোল্লা বলেছেন, 'শিল্পের জমি আর নেবে না সরকার, শিল্পপতিরাই কিনবে তা নিজ প্রয়োজনে।' অতএব রাজ্যে শিল্প নাই। রেজ্জাক সাহেব আরও বলেছেন, 'দো-ফসলী কোনও জমিতেই আর চলতে দেওয়া হবে না নগরায়নের ভিত্তি রচনা।' অতএব রাজ্যে আর নতুন পর্যায়ে কোনও নগরায়ন নাই, অন্তত ২০১১ সাল পর্যন্ত নাই। কেন নাই? — না, রাজ্যে একফসলি জমির পরিমাণ তো এক পার্সেন্টের মতো। তাও আবার রয়েছে সেই বীরভুম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায়। তাহলে উপায়? 'দাও চিত্তে বল, দেখাও সত্যের মূর্তি, কঠিন নির্মল'।...

যে জুরুং কনসালট্যান্টসগণ নয়াচরকে অনুমোদন দিয়েছিল, তারা সিংগাপুরের নিকটতম দ্বীপাবলীর উদাহরণগুলিও দিয়েছিল। কিন্তু, এরা গোপন করে ফেললো সেই তথ্য যে, নয়াচর হিমালয় থেকে ক্ষয়প্রাপ্ত পদার্থের ভিতের ওপরে দাঁড়ানো। যুগযুগ ধরে প্রবাহিত পলিমাটি দিয়ে গঠিত এই নড়বড়ে দ্বীপ— সিংগাপুরে কোনও নড়বড়ে পলিমাটির দ্বীপ বা নদী নাই, যা ভূখণ্ডকে দূষিত করে। গোপন করা হচ্ছে কনসালট্যান্টসগণের সেই আশঙ্কা যে, নয়াচরের খুব কাছের দ্বীপ লোহাছাড়া, সুপারীভাগা, কাপাসগাড়ি, বেডফেড়ি দ্বীপগুলি জলের তলায় তলিয়ে গেছে উষ্ণায়নের জেরে— উষ্ণায়নে হিমালয়ের হিমবাহগুলির গলনক্রিয়া আরম্ভ হলে খোদ নয়াচরও ডুবে যাবে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে।...

'মেজর ইঞ্জিনিয়ারগণ বলেছেন, রাসায়নিক প্রকল্প পরমাণু প্রকল্পের মতোই ভয়ঙ্কর। তাদের বর্জ্য পদার্থ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। ফলে, নৌ-চলাচল বেড়ে যাওয়ায় জলে অশোধিত তেলের পরিমাণ বেড়ে যাবে, সামুদ্রিক প্রাণী-জগতে ভারসাম্য ব্যাহত হবে... মাছের আকাল হবে... বিষাক্ত রাসায়নিক প্রবাহে সুন্দরবন ধ্বংস হয়ে যাবে।' (গ. শ., দূষণ মণিটরিং কমিটি, যা হাইকোর্ট নিযুক্ত করেছিল তার সদস্য শ্রী সুব্রত সিন্‌হা)।

তবু.... তবু, শুভ্র ধুতি-পাঞ্জাবীর সঙ্গে ইদানীং কালো চশমায় সজ্জিত সেই শুভ্রকেশকর্তা বলেছেন, 'আহারে, এখানে যেন নাগাসাকি হচ্ছে।'

না। না পাঠক, ভুল করেও তোমার কণ্ঠে যেন উচ্চারিত না হয় — বাহারে, মুখের কী ভাষারে.....

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হচ্ছে

পুজো মানেই ঠাকুর দেখা পুজো মানে হারিয়ে যাওয়া
পুজো মানেই খাওয়া-দাওয়া পুজো মানে চাওয়া-পাওয়া
পুজো মানেই একটু ছোঁয়া ওলট-পালট মুগ্ধ হওয়া

পুজো সংখ্যার অনবদ্য পুষ্পাঞ্জলি

উপন্যাস
সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত
সুমিত্রা ঘোষ
দীপঙ্কর দাস
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

গল্প
রমানাথ রায়
শেখর বসু
এষা দে
গোপালকৃষ্ণ রায়
দীপক চন্দ্র,
জিষ্ণু বসু

ষষ্ঠীতে দেবী ভাবনা
সপ্তমীতে গল্প
অষ্টমীতে প্রবন্ধ
নবমীতে উপন্যাস
দশমীতে ছড়া
শেষ প্রহরে রম্যরচনা

প্রবন্ধ
প্রণব চট্টোপাধ্যায়
প্রণব রায়
দেবীপ্রসাদ রায়
তথাগত রায়
রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী
দীনেশচন্দ্র সিংহ
বলরাম চক্রবর্তী
নৃপেন্দ্র প্রসন্ন আচার্য
সুমিত চক্রবর্তী

সত্বর কপি বুক করুন ● দাম চল্লিশ টাকা মাত্র

রম্যরচনা : চণ্ডী লাহিড়ী ● ছড়াকাহিনী : শিবাশিস দত্ত ● দেবী প্রসঙ্গ : স্বামী অশোকানন্দ

Swastika
31 August - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

63rd Independence Day

Golden Gujarat
1960 - 2010

Narendrabhai Modi
Chief Minister, Gujarat

ATTRACTING INVESTMENTS TO ACHIEVE DEVELOPMENT

Gujarat - The Growth Engine of India, has ensured growth and development for all sections of the society. It has become a shining example for the rest of India in implementing inclusive growth through a sustained and brisk pace of development. The state has stayed abreast with some of the fastest growing economies in the world, even in these times of global meltdown. It owes its performance to the following factors :

- The Vibrant Gujarat Global Investors' Summit 2009 attracted more than Rs. 12 lakh crores investment through 8500 MOUs creating more than 25 lakh jobs in Gujarat
- Rs. 6 lakh crores of investment is coming in infrastructure sector in port, power, roads and airports
- Graduating from Industrial Estates to Special Economic Zones (SEZs) and now on to Special Investment Regions (SIRs)
- Estimated demand for electricity in the next 5 years - 19,351 mega watts. Planning to generate 19,259 mega watts of electricity by 2012
- Gujarat accounts for 55% of the total employment generated in the country through employment exchanges

INF-6/09-10

63rd Independence Day Greetings

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com